নবনীতা দেবসেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারানী দেবী
আমার কবি মা-বাবাকে

এই লেখকের :

আমি, অনুপম (উপন্যাস) ২০·০০

নিবেদন

এখানে রইল তিরিশ বছরের কবিতার টুকরো। এতদিন ছেদহীনভাবে কবিতা প্রকাশিত হলেও ১৯৭১-এর পরে আমার কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, শুধু গদ্যগ্রন্থই বেরিয়েছে। সেজন্য এখানে বই থেকে চয়িত ও অগ্রন্থিত কবিতা সংখ্যায় প্রায় সমান। তিনভাগে কবিতাগুলিকে সাজানো হয়েছে। প্রথমভাগে আছে ১৯৫৭-৫৯-এ লেখা, ১৯৫৯-এ প্রকাশিত আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয়' থেকে নেওয়া কবিতা, দ্বিতীয়ভাগে ১৯৫৯-৭১-এ লেখা, ১৯৭১-এ প্রকাশিত আমার দ্বিতীয় কবিতার বই 'স্বাগত দেবদূত'-এর কিছু কবিতা, আর তৃতীয়াংশে সবই অগ্রন্থিত (কিন্তু প্রকাশিত) কবিতা। 'রক্তে আমি রাজপুত্র' নামে একটি বই বেরনোর কথা ছিল ১৯৭৫ নাগাদ, আমারই আলস্যে বের হতে পারেনি। তার কবিতাও এই অংশে অন্তর্ভুক্ত। এই তৃতীয়ভাগে ১৯৭২-৮৮ পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতার কিছু সন্নিবেশিত হলো। তৃতীয়াংশের শেষার্ধে কিন্তু কালানুক্রম বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। মাঝে কিছু কবিতা থীম অনুযায়ী গেছে, এবং শেষের দিকে কিছু সত্তরের দশকের কবিতা আছে। তর্জমা কবিতা একটিও রাখা হলো না। কবিতাগুলিকে 'শ্রেষ্ঠ' বলতে যার পর নাই কুণ্ঠা বোধ করছি; নির্বাচনও ভেবেচিন্তে করিনি তেমন, নেহাৎই তাড়াহুড়োয় সাজানো। একটি কবিতা লিখতে আমার বহুদিন সময় লাগে, তার বেলা তাড়াহুড়ো করি না বটে, কিন্তু পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে অমনোযোগ আমার স্বভাবসিদ্ধ। এখানে পাঠকের ক্ষমা ও প্রশ্রয়ের প্রার্থী। স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীস্বপন মজুমদারের উদ্যোগেই এ বইটির প্রকাশ ঘটল। যাঁরা বাংলা কবিতা ভালোবাসেন, তাঁদের ভালো লাগলে, এই প্রকাশ সার্থক।

নবনীতা দেবসেন

"ভালো-বাসা"
৭২ হিন্দুস্থান পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০২৯

নবনীতা দেবসেনের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

আরোগ্য

শুধু তুমি সুস্থ হবে।
আমি দিয়ে দেবো আমার কোজাগরীর চাঁদ,
শাদা দেয়ালের ময়ূরকণ্ঠী আলো,
দিয়ে দেবো বিগত বছরের মরা পাখির মমতা,
আর আগামী বছরের কলাগাছটির স্বপ্ন।

চ'লে যেতে যেতে সবাই তো তাই ব'লে গেলো।

কুন্তী নদীর গেরুয়া জল তার সবুজ ছায়া-কাঁপা ঠাণ্ডা গলায়
আমাকে বলেছে,
শুকনো সোনালি গোরুর গাড়িগুলো
ক্লান্ত কাদাটে গলায় আমাকে বলেছে,
শেষ হেমন্তের বুড়ো সবুজ পাতারা
আসন্ন মৃত্যুর খস্‌খসে গলাতে বলেছে

তুমি সুস্থ হ'লেই ওরা আবার ফিরবে।

এমন কি
তুলসীতলার যে-প্রদীপটি ধ'রে তুমি
আমার মুখ দেখেছো, তাকেও ভাসিয়ে দিয়ে,
একটি শুভ্র স্তব হ'য়ে জ্বলবো তোমার শিয়রে
আসুক, ওরা ফিরে আসুক, যারা চিরকাল
শুধুই চ'লে যাচ্ছে, এখান থেকে অন্যখানে
উৎপাটিত একগুচ্ছ কচি সবুজ দূর্বার মতো
তুচ্ছ, উষ্ণ, কাতর
আমি তোমার যন্ত্রণা মুছে নেবো :
তার বদলে, ঈশ্বর, তার বদলে আসুক
তোমার কাঙ্ক্ষিত আরোগ্য॥

মিথ্যে

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আয়না তুমি কার, পারুল তুমি কার, ইচ্ছে তুমি কার। ওরা বললে, কেন, তোমার। আমি বললুম, কখ্খনও না। ওরা হাসলো। আবার বললুম, আয়না তুমি কার, পারুল তুমি কার, ইচ্ছে তুমি কার। ওরা বললে, শুধু তোমার। আমি বললুম, বিশ্বাস করি না। ওরা কাঁদলো। যেদিন ডাকলুম, আয়না তুমি আমার, পারুল তুমি আমার, ইচ্ছে তুমি আমার,—সেদিন রুপোলী ঝড় গোঁ-গোঁ ক'রে রেগে বললে, মিথ্যে কথা। আমি বললুম, না, না—ঝড় বললে, মিথ্যে কথা। আমি কাঁদলুম, আমার, আমার। ওরা সাড়া দিলো না।
রুপোলী ঝড় হা-হা ক'রে হেসে ব'লে গেলো, মিথ্যেবাদী ॥

পূর্ণিমা

দেখেছি গঙ্গায় আমি ব্যর্থ এক চাঁদ ডুবে যেতে।
যদিও বজরা ভ'রে প্রেমিকের কল্লোল স্বনিত
তারাদের নাভিশ্বাস, সকালের আলোর গুঞ্জন
সব ধ্বনি গ্রাস ক'রে চাঁদ শুধু শব্দময় হ'লো।

সারারাত্রি সারারাত আকাশের বিলোল প্রাসাদে
স্বপ্নচারী শুভ্রচাঁদ সময়ের সঙ্গীত শুনেছে
তারপর তমোহীন স্বপ্নহীন পরিচ্ছন্ন ভোরে
অকস্মাৎ আত্মদ্রষ্টা বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীর মতো

অনুদ্বিগ্ন পূর্ণচাঁদ শূন্যহাতে নেমে গেলো জলে।

ঋতু

তোমাকে জড়াতে চাই ঋতুর কৌতুকে,
এ-কোলে ও-কোলে তুলে রাখি,
খানিক বিভ্রান্ত হও, সন্দিহান সুখে—
তবুও, পুরোটা নয় ফাঁকি।

কপট পাশার জুড়ি না-হয় হ'লেই,
খেলুড়ি তুমি কি কিছু কম?
কৌশল তোমারও জানা, কেবল যা নেই
তা হ'লো, আমার সংযম।

যখন সংসারে ভোর পাখির কূজনে
তখন ঘরের দোর খুলে
না-হয় ভেসেই গেলো আবর্তে দু'জনে
মন্দির, ক্ষেতের কথা ভুলে!

তবুও আকাশে বর্ষা, সমুদ্রে ও মাঠে
ভাবানুষঙ্গের দায় ঋতুর চৌকাঠে॥

অজাত প্রেম

কোনো দুরন্ত সম্মান দিয়ে তাকে
অমন দু'হাতে জড়াতে চেয়ো না, মন—
মাঠের শস্য বোনা ও তোলার ফাঁকে
কাটাতেই হবে অনেক, অনেক ক্ষণ।

কোনো বাসন্তী অভিমান দিয়ে ঘিরে
কপট কলার আলপনা আঁকা ছাড়ো
কথা-ফুলে-গাঁথা তীক্ষ্ণ গোপন তীরে
মিথ্যেই তাকে বিদ্ধ কোরো না আরো।

সে আজো আকাশ, সে আজো সাগর, পাখি—
তবু কি চেনোনি চোখে গর্ভিণী ভাষা
ভূমিষ্ঠ হ'তে হয়তো অনেক বাকি
অধৈর্য হ'য়ে হত্যা কোরো না আশা।

রেখা

একান্ত স্বপ্নের সুর, স্মৃতি—
শঙ্খশাদা, অথচ গোপন
কৃষ্ণা চতুর্দশী হোক তিথি
রবীন্দ্রসংগীত হ'লো মন।

সমুদ্রে বলিষ্ঠ বাহু মেশে
তেপান্তরে সুডোল চিবুক
সরীসৃপ প্রতিজ্ঞারা এসে
পুষ্পে ঢাকে নিয়তির বুক।

ঘটনা বিস্তারে অভিনব
হৃদয়ে তো সেই চিরন্তন
মধ্যরাতে অমৃতসম্ভব
পূর্ণ কোনো নিভৃত মরণ।

শেষ অঙ্ক

অন্ধকার অমাবস্যা হ'য়ে
সে এসে দাঁড়ায় মন ঢেকে
যন্ত্রণার তারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
নয়নে চরণরেণু রেখে।

তবু বলি, মিনতি আমার
এখনি যেয়ো না, যদি এলে—
দেউলে আগুন জ্বলে যার,
না-হয় শেষাঙ্ক দেখে গেলে।

সোনার হরিণের ছড়া

সোনার হরিণ হারালে হারাবো
কী আর করা।
বৃষ্টি ঝরে না কতকাল, শুধু
শুকনো খরা।
সুতনুকা নদী শুকিয়ে হ'লো কি
বালির চড়া।
সোনার হরিণ সোনার হরিণ
হীরের চোখ।
ঝরাক বৃষ্টি সোনালি ধানের
ফসল হোক।
হীরের বৃষ্টি সোনার ফসলে
ঝড়ের নখ।

সোনার হরিণ হারালে কি চলে—
ক্লান্ত মাটি
বৃষ্টির মুখ চেয়ে বসে আছে
ধানচারাটি।

নদীর হাওয়া

অন্ধকারে বৃষ্টি পড়েছিলো
গাড়ির কাচে নৃত্যপর ছায়া
নদীর হাওয়া হঠাৎ ছুঁয়ে দিলো
চিত্তে কাঁপে গোপন অশনায়া···
অনেক দূর অনেক দূরে বাড়ি
পিচের পথ বৃষ্টি-ভেজা নদী
অনুত্তর অন্তহীন পাড়ি
অন্ধকার ঝরলো নিরবধি।
বারংবার কথার খোঁজে ঘুরে
ক্লান্ত স্নায়ু, আগুন, শাদা ধোঁয়া,
গন্ধ এলো জানলা দিয়ে উড়ে
মাটির, কাদা, ঘাসের ভিজে ছোঁয়া···
বৃষ্টি নাচে ব্যর্থ সমারোহে
জগৎ চেরে বিদ্যুতের ফলা
ঘণ্টা বাজে বাক্যহারা দেহে
অন্ধকারে অন্তহীন চলা···

এবং সেই যাত্রা থেমে গেলে
অন্ধকার উড়লো ডানা মেলে
সূর্য-বেঁধা ধূ-ধূ বালির চরে
নদীর হাওয়া কাঁদে হলুদ খড়ে।

বৃন্তহীন একটি গোলাপ

কিন্তু, তুমি এখন তো জানো
বর্ণ গন্ধ ফুলের জঞ্জালে
বুক রেখে কিংবা মুখ রেখে
কোনো লাভ নেই।

জেনেছো তো কী ক'রে এসব
সহজেই স্পষ্ট মুছে যায়
হাওয়া, বৃষ্টি, মেঘে
বসন্তের সোচ্চার প্রার্থনা
কী ক'রে ফোটায়
শরতের ক্লান্ত শাদা ফুল।

সব চোখ দূরে রেখে এইবার তবে
আদিগন্ত প্রান্তরে দাঁড়াও।
তোমারই উদ্দেশে জন্ম নিক
বর্ণে গন্ধে তীব্র রাজকীয়
বৃন্তহীন একটি গোলাপ।

মাথুর

[বকুলের বুকের ওপর
বারবার হাওয়া বয়, তবু
বসন্তের আকাশ পাথর।]

বসন্তে কে আর ফিরে আসে
নিসর্গের বৃন্দাদূতী ছাড়া
সব নদী মিলায় আকাশে।

বরং পাখিরা উড়ে গেলে
হুলুরব করুক বধূরা
রাধা-অঙ্গ তমালের ডালে—

অভিষেক-উত্তপ্ত মথুরা।

প্রথম প্রত্যয়

বৃষ্টিতে ওড়ালো পর্দা,
পর্দা ওড়ে, শ্রাবণ-সকাল
সব দরজা খুলে যায় পিছনের পথে
শুকনো পাতা ভিজে,
পদচিহ্ন ঢেকেছে শৈবাল।

বৃষ্টিতে পেতেছি মুখ,
সিক্ত কেশে ঢেকেছি শরীর
এবার উপরে চোখ তুলে
প্রথম প্রত্যয়ে বলি
অসংকোচ নির্ভার আলোয় :
—সব গেছি ভুলে।

তরু

যদি সেই মহামহিমায়
যা কিছু সকলি জেগে থাকে
তবে সেই প্রথম হৃদয়
জুড়োলো নদীর কোন্ বাঁকে ?

কিছু নীল, সবুজ, গভীর
সময়ের দূর সরোবর
বালিহাঁস, গাঢ় লাল তীর.
তৃষিত সোনার বালুচর···

তারপর কাচের পুকুরে
লাল নীল বেগুনী হলুদ
শফরি সলীল, বেকসুরে
শোধ করে জীবনের সুদ।

যদি সেই মহামহিমায়
সব শিখা চিরকাল জাগে
তবে সেই প্রথম হৃদয়
আবারও জ্বলুক সংরাগে

কোথাও রয়েছে সেই তরু
যা কিছু সকলি বুকে নিয়ে
ব্যর্থ ক'রে নির্বেদের মরু
নিয়ে যাবো মুকুল কুড়িয়ে।

দ্বন্দ্ব

একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও
আমি তোমার চোখের মধ্যে একটু হাসি।
সে-হাসির আদরে তোমার চোখ কাঁপুক
তোমার চোখ কাঁপুক
তোমার চোখ লাজুক
আমি কাঁপি আমি কাঁদি আমি দাঁড়াই।
তোমারই মতো একা, ব্যাপ্ত
সহস্রাক্ষ সহস্রবাহু
অনাদি অনন্ত অজর
নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনুক্ষণ লীলায়িত
আমি
তোমার আশ্চর্য অনিবার্য সঙ্গী।

ওপরে ফাঁকা নীচে ফাঁকা সামনে ফাঁকা পিছনে ফাঁকা
সময় যখন আপনি ফাঁকি দেয়
সেই তো ইচ্ছার লগ্ন।
আমি এসেছি তুমিও এইবার এগিয়ে আসবে

রাগ কোরো না ত্যাগ কোরো না আশা কোরো না, শুধু তাকাও
আমার নির্মল আকাশে তোমার সোনালী রোদ্দুর
ভয় কোরো না জয় কোরো না ছলা কোরো না, শুধু তাকাও
তোমারই মতো উজ্জ্বল আর নিষ্ঠুর, দর্পিত আর মায়াবী,
পবিত্র আর করুণ আঁখির অরণ্যে
শ্রাবণের বৃষ্টির মতো তাকাও
ভৈরবী স্বপ্নের মতো
বৈরাগী মৃত্যুর মতো
নিশ্চিত
আর মনে করো তুমি আমার জন্যে
বৃষ্টি আমার জন্যে, বকুল আমার জন্যে, শস্য আমার জন্যে
মনে করো, দুঃস্বপ্ন আমার, নৈবেদ্য আমার, চৈতন্য আমার
আর তখন আমি তোমার হই, তখন
আমি তোমার হই
তুমি
আমার কোলের শিশু হ'য়ে আমাকে বরণ করো
আমাকে হরণ করো
পূরণ করো।

খেলা

আমি তো চাই কঠিন অসিধারা—
দৃশ্যাতীতে অতনু প্রশ্রয়
হলুদ হ'লে লোহিতে দিশেহারা
দীঘির জলে নয়ন ঢাকে ভয়।

হয়তো ছকে তোমার চেনা ঘুঁটি
এবং খেলা তোমার স্থির জয়
তবুও আমি চতুরতর জুটি
আমার হারে তোমার জিৎ নয়॥

স্থির বিন্দু

নৌকো কাঁপে, অন্ধকার, গান,
গঙ্গা ছুঁয়ে সান্ত্বনার ভাষা
যৌবনের চিরন্তন ধ্যান
যৌবন-উত্তীর্ণ ভালোবাসা।

কী যে আছে, কিছু থাকে কিনা
সব প্রশ্ন অবান্তর হ'লে
অতঃপর জমে কিছু দেনা
বিশ্বাসের অন্দর-মহলে

যার শুরু যার সারা সব
একটিই বিন্দুতে উপনীত
আর সেই মহৎ উৎসব
যৌবনেও যৌবন-অতীত।

মন্দির

তোমার জন্যে আকাশ, নদী, ফুল, কিংবা বই, ছবি
তোমার জন্যে সকাল, বিকেল, রাত্রি
তোমার জন্যে সব

দূরে দূরে   তারায় তারায়   তোমার তারায়
একটি ছায়ার শরীর, কঠিন অন্ধকার,
একটি বিষাক্ত তীর,
কাঁপন, মাটির কাঁপন, চষা মাটির কাঁপন,
অমোঘ মুঠোয় নীল যন্ত্রণার ঘূর্ণি,
(নাকি প্রার্থনার সুখ ?) আহা

প্রথম পাপের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পুণ্য।

পাহাড়

কেউ বলুক, না বলুক, তুমি সব জানো।
তবু কোথাও পাহাড় আছে
ছোটো কথা, বড়ো কথা, ছোটো দুঃখ, বড়ো বেদনা
সব ছাড়িয়ে
মস্ত এক হাসির পাহাড়।
একদিন
সেই পাহাড়ে ঘর বাঁধবো তোমার সঙ্গেই।
লোকে বলুক, না বলুক, তুমি জানো।

লগ্ন

তাদের সবাইকে ডেকে বললুম, "তবে যাই।"
—"যতদূরেই যাও-না-কেন, ফিরতে তোমায় হবেই," তারা বললো।
—"কিন্তু কেউ তো সে-দেশ থেকে ফেরেনি। সেই চিরদিনের বিদেশে তারা হারিয়ে গিয়েছে। সেই ছোটো শিশু, যে হামা দিতে দিতে গড়িয়ে পড়লো, ওই যে মেয়েটা পেয়ারা পাড়তে গিয়ে খ'সে পড়লো, প্রিয়ের কোল থেকে এলিয়ে পড়লো যে-তরুণী, কেউ তো ফিরলো না।"
—"সবাই ফিরেছে।" তারা বললো, "সবাই সংহত হয়েছে একটি সজীব বিন্দুতে যা তাদের নিয়েও তাদের ছাড়িয়ে আছে। তুমিও ফিরবে।"
—"কিন্তু কোন্ পথে? যাবার পথ তো আমার পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হবে, আর আমি অতিক্রান্ত হ'লেই তার বিনাশ। ফেরার পথ আমি কেমন ক'রে চিনবো?"
তারা জবাব দিলো, "যতদূরেই যাও-না-কেন ফিরতে তোমায় হবেই। যে-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছো, আসলে তুমি সে-বিন্দুতেই থাকবে, কারণ তা অতিক্রম করা অসাধ্য। যে-পথ তুমি এইমাত্র গড়বে, সে-পথ গড়া ছিলো, চিরকাল গড়া থাকবে। আসলে কোনো কিছুই বদলায় না আর সব কিছুই ছিলো, থাকবে। তুমি কোথাওই যাবে না কারণ অন্যত্র, অন্য কোনোখান ব'লে কিছু নেই।" বলা হ'য়ে গেলে তারা, আমার বকুল-পারুল শাল-

পিয়ালেরা ওপর দিকে আঙুল তুলে দেখালো, যে-আকাশ তারা চিরকাল দেখিয়েছে।
আর আকাশ ঠিক তেমনি ক'রেই ব'য়ে যেতে লাগলো, সময়ের নিঃশব্দ-মুখর বৃষ্টি ঝরিয়ে।

আদি-অন্ত

আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে? সে বললো, নীল আকাশ। আকাশ ছাড়া তোমার আর কে আছে? সে বললো, সবুজ ধান। ধান ছাড়া আর কে আছে? গেরুয়া নদী। নদীর পরে? পঞ্চবটি। পঞ্চবটি ছাড়া? সোনালি হরিণ। হরিণের পরে? ঝড। ঝড় ছাড়া? অশোক কানন। অশোক কাননের পর তোমার আর কে আছে? কালো মাটি। কালো মাটির পরে? তুমি আছো।

এই প্রিয় মুখগুলি মেঘের মতন

প্রিয়জনদের জরা আমি আর দেখতে পারি না

আমি চোখ মেলে-মেলে দেখতে পারি না
এই প্রিয় মুখগুলি মেঘের মতন গ'লে যায়
চোখের পুকুর ঘিরে পানা ছেয়ে আসে, প্রিয় ভ্রূর
রেখাগুলি ডানা গুঁজে ম'রে যাওয়া পাখির মতন
মুখ থুবড়ে পড়ে, এত প্রিয় ওষ্ঠাধর ঝড়ে ঝ'রে পড়া
অপক্ক ফলের মতো ধুলোয় শুকোয়, সব কী-ভাবে শুকোয়,
সব কী-ভাবে এখন ওড়ে হাওয়ায়-হাওয়ায়
কুচি-কুচি কাগজের মতো সব কী-ভাবে মিলায়।

কী-ভাবে হৃদয় ছাউনি গুটিয়ে ফেলে
প্রস্তুতিতে পথে নেমে আসে,

এইমাত্র হাত তুলে ভাড়াগাড়ি যে-কোনো থামাবে,
হাত তুলে, বিদায় জানিয়ে চ'লে যাবে!
কী-ভাবে এখন দেখি হৃদয় গুটোয়।
কী-ভাবে অন্তর সব ঝকঝকে বাসনগুলো তাক থেকে নিয়ে
ভীষণ ঝংকার তুলে পাথরে ছিটিয়ে ফেলে ভাঙে,
কী-ভাবে এমন ক'রে রোদে সব শব্দ মিশে যায়,
সব চিহ্ন গ'লে যায়,
এই প্রিয় মুখগুলি মেঘের মতন
আকৃতি বদল ক'রে ভেসে চ'লে যায়
আমি চোখ মেলে রেখে ঘাস জ্ব'লে যাওয়া
এত কাছের উঠোন আর
দেখতে পারি না।

রথের মেলায়

রথের মেলায় তুমি বলেছিলে সঙ্গে নিয়ে যাবে।
আমি ভেঁপু কিনবো রঙচঙে, রথ কিনবো দুটো ঘোড়া
জোতা, হাঁড়িকুঁড়ি, বুড়োবুড়ি, কাঁচকড়ার
মেমপুতুল, মুখোশ। হাটসুদ্ধু কিনে ফেলবো
এত লম্বা ফর্দ বানিয়ে, আমি একখুবি
পয়সা জমিয়ে ব'সে রইলুম দাওয়ায়
তুমি ফিরে এসে সঙ্গে ক'রে রথের মেলায়
নিয়ে যাবে।

দাওয়ায় ব'সে ব'সে আমার হাত-পাগুলো
লম্বা হ'য়ে গেলো, ফর্দটা উড়ে গেলো হাওয়ায়,

আমার খুরিভরা ফুটো পয়সা তোরঙ্গভর্তি মোহর
হ'য়ে গেলো—তোমার রথের মেলা থেকে
আমার আর কেনবার কিছু রইলো না।

এবার আমি দাওয়া ছেড়ে উঠে যাবো।

বাড়ি

এ-বারান্দা, ও-বারান্দা, এ-ঘরে সে-ঘরে আমি
কেবলই পালাই। একটাই বাড়ি আর ঘর কটা
গোনাগুন্তি, তাই অতঃপর ঘুরে-ঘুরে যেখান
থেকে শুরু সেখানেই ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে আসি।
দেওয়ালের ছবিটা যতই রঙ্গিণীর হাসি হাসে,
মেঝের ছায়াটা তার বিরোধিতা করে। কী ভীষণ
উচ্চ শব্দে চেঁচামেচি চলে এ-বাড়িতে, কাচগুলো
খান্‌খান্‌, বাসনকোসন তোলপাড়, প্রচণ্ড
কলহে মত্ত এ-বাড়ির দরজা-জানলা-ছাদ-
দেয়াল-দালান। আমি পালাতে-পালাতে
একদম ক্লান্ত হ'য়ে আঁচল বিছিয়ে
এই উন্মত্ত মেঝেতে শুয়ে পড়ি।

বৃষ্টি পড়লে

বৃষ্টি পড়লে মনে হয় ঘরটাই নীল হ'য়ে কেঁপে-কেঁপে
ঝ'রে পড়লো, যেন অজস্র সময় এসে কোথা থেকে
ঘর ভ'রে দিলো, যেন অজস্র বাতাস এসে ঘরটাকে
নদীকূলে তুলে নিয়ে গেলো, নৌকো হ'য়ে ভাসলুম
ভিজলুম, দুলতে-দুলতে কাঁপতে-কাঁপতে চলতে
লাগলুম, ঐ দেখা যায় মোহানার রেখা, যেন
চারদিকে ঢেউ ফুঁসে উঠছে যেন কেউ কোনোদিকে
নেই যেন গভীর কান্নায় গলা বন্ধ হ'য়ে
যায় যেন ভয়াল কঠোর কান্না ঘরটার
কণ্ঠরোধ করে—কেমন আশ্চর্য নব ইন্দ্রজালে
দশদিক মুহূর্তে চমকায়, যেন সব কিছু ঠিক
আসল চেহারা হ'য়ে যাবে, যেন সবই নাচ,
সবই ছন্দ, সব কিছু রঙ-করা আলো—
ঘুম ভেঙে বৃষ্টি দেখলে মাঝে-মাঝে এ-রকম
হয় তখন প্রার্থনা করি হে আকাশ
ঘর ভেঙে আরো বৃষ্টি দাও।

টেলিফোন

মাঝে-মাঝেই, ঘরের কাজে যখন ব্যস্ত থাকি,
আমার যেন মনে হয় উপরে ঘণ্টি বাজছে,
টেলিফোন। হাতের কাজ ফেলে ছুটে যেতে গিয়ে
খেয়াল হয় ওটা আমাদের বাড়িতে হ'তে পারে
না। বন্ধু থাকলেও, আমাদের ফোন নেই।
ভালো ক'রে কান পেতে শুনলে বুঝতে পারি

ঘন্টিটা আসলে বাজেইনি। এ-বাড়িতে নয়,
কোনো বাড়িতেই নয়। ওটা আমার মনের ভুল।
আবার হাতের কাজটা তুলে নিই। কাজ শুরু
করলেই অনেক দূরে টেলিফোন বাজতে থাকে।
আমি অস্থির হ'য়ে শুনতে পাই, কেউ
সাড়া দিচ্ছে না, ফোনটা বেজেই চলেছে
একটানা। যদিও জানি তা এ-বাড়িতে নয়,
ও-বাড়িতে নয়, কোনো বাড়িতেই নয়।

শফরী আমার

বুকটাকে কাচের চৌবাচ্চা ক'রে আমি
লাল-নীল ভালোবাসাগুলি সযত্নে পুষেছি
তোমাদের প্রত্যেকের নামে-নামে পৃথক শফরী
হৃদয়ে আমার খেলা করে
তৃপ্তিভরে চেয়ে থাকি
আহা, প্রীতি, স্নেহ, ভালোবাসা
আমার হৃদয়ে তারা ঘর পেয়ে
কেমন স্বচ্ছন্দে খেলা করে···

হঠাৎ মার্জার এসে কাচ ভেঙে সব মেরে গেলো।

অভঙ্গুর

কে অন্যের ঘর ভাঙতে জানে ?
এমন নিটোল মুক্তো
ঘরের মতন
এত অভঙ্গুর সত্য
স্পর্শ করে এত শক্তি কার ধমনিতে !
কে অন্যের ঘর গড়তে জানে ?

যার-যার নিভৃত কুঠুরি
তরঙ্গে-তরঙ্গে গড়ি রেশমি পোকার মতো একা
একান্ত স্বগত
অবিকল্প
স্বয়ংকেন্দ্রিক ।

সেই ব্যক্তিগত ঘর যদি ভেঙে যায়—
নিশ্চয় নিজের হাতে শাবল চালিয়ে
খিলেন ভেঙেছো । খিলেনের চাবির পাথর
যে গড়েছে, শুধু তার চেনা ।
নতুবা, পিত্তের দোষ দিয়ো ।
অন্যে-পরে পারে না এসব ।

আর পারে, কেবল দেবতা ।

যত নীল পাগল পাহাড়

সব নীল পাহাড়েরা আস্তে মুছে যায়
অগ্রসর দেওয়ালের নিচে
এবং হঠাৎ
একটি উলঙ্গ তরু সামনে দাঁড়ায়
অবিশ্বাস্য স্পষ্টতায়
লুকোনো সূর্যের কোনো খাপছাড়া শিখা
তাকে সহসা সাজায়
প্রায় হাস্যকর
অস্থিসার হাতগুলি জট পাকিয়ে যায়
আকস্মিক পর্দা-ছেঁড়া আলোর দয়ায়
যখন সে গোপনে ব্যস্ত ব্যক্তিগত কাজে—
ও কে
শক্তিমান, বহুভুজ, ভয়াল দেখায়
তামার মূর্তির মতো, নগ্ন দেবতার।
বুটিদার পটভূমি ক্রমশ হারায়
গাঢ় শাদার প্রলেপে
শাদার প্রত্যেক ঢেউ খাঁটি জরিপাড়
প্রত্যেকটি পাহাড়ের ঢালে।
দীর্ঘ মিনারটি যেন মুঠোয় আঁকড়ে রাখে
যা কিছু ধরার।   চুড়োর জানলায় বুঝি
অগ্নিকাণ্ড লাগে, একফালি আগুন নাচে
কোনাচে চুড়োয়, যেন
জ্যোতির্মণ্ডলে ঘেরা দুষ্ট দেবদূত···

আর
লালচে ছাদের নিচে শাদা কুঠিগুলো
হঠাৎ অলস, ক্লান্ত, অন্তর্বর্তী হয়
তারপরে
মেঘেরা বাজনা বদল করে, তারপরে

আলোরা নাচ বদল করে, তারপরে
সব নীল পাহাড়েরা আবার জন্মায়
শূন্যস্থান থেকে।

ছুটি

তোমার জন্যে কী না পারি ? প্রিয় আমার,
আমার যা-কিছু সকলই তোমার জন্যে সাজানো আছে ;
তোমায় শুধু খুশি দেখবো ব'লে আমি কী না
করতে পারি, প্রিয় আমার !
বকুল ফুলের গন্ধ তোমার সয় না বলেছিলে,
আমার উঠোনে প্রপিতামহের বকুল গাছটা
আমি তাই কেটে ফেলেছি। তোমায় খুশি
দেখবো ব'লে।
রত্ন পেলে হয়তো তোমার ভালো লাগবে ভেবে,
দ্যাখো দ্যাখো আমি আমার শিশুর হৃৎপিণ্ডটা
কোল থেকে কেমন উপড়ে এনেছি, তোমার
রত্নকোষের জন্যে। (এর চেয়ে দামি রত্ন
আমি আর কোথায় পেতাম !) শুধু তোমায়
খুশি দেখবো ব'লে।

কিন্তু, কী আশ্চর্য, প্রিয়, মানুষের অন্তরের খেলা !
তবুও আমাকে তুমি ছুটি দিয়ে দিলে।

দ্বীপান্তরী

এখন তাহ'লে আমি বিনা প্রতিবাদে
সব অভিযোগগুলি মাথা উঁচু ক'রে মেনে নিয়ে
স্পষ্টত অন্তরশূন্য প্রস্তরফলক হ'য়ে যাবো।
আমি তোমাদের সব প্রীতিহীনতার পাপ
নিজেই স্বীকার ক'রে নিয়ে, নিজের মণ্ডলে স'রে যাবো।

একদা নির্জন রাত্রে অকস্মাৎ শূন্য আদালতে
বিচারক, বাদীপক্ষ, উকিল, কেরানি
একজোটে চায়ের টেবিলে গোল হ'য়ে, আমাকে একেলা
নিতান্ত নিঃসঙ্গ, নগ্ন, কাঠগড়ায় তুলে
দ্বীপান্তরে ঠেলে দিয়ে, দল বেঁধে
চায়ের মজলিশে ফিরে গেলো।
যাবজ্জীবন সেই চায়ের আসরে তোমরা বন্দী হ'য়ে আছো
আমি পাল তুলে, ভেসে-ভেসে দ্বীপে চ'লে যাবো।

হৃৎপিণ্ড কোনোদিন ছিলো কি ছিলো না—
কৈফিয়ৎ অদরকারি। সব কিছু পেয়েছিলে, যা-কিছু
আমার বুকে ছিলো। বিনা প্রত্যাশায় আমি
নিরাকার প্রিয়মন্যতায় পকেট ভরিয়ে নিয়ে
এইবারে দ্বীপে চ'লে যাবো।

সেই দ্বীপে কোনোদিন তোমাদের জাহাজ যাবে না।

একদিন পাতিহাঁসের মতো

চুপ ক'রে থাকতে-থাকতে একদিন
বুলি ফুটবে। একদিন
নদীর বাঁকে থেমে দাঁড়িয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে
হেঁকে বলবো : 'আর নয়।'
সূর্য পাটেই নামুক আর শিয়রেই জ্বলুক
আমি বলবো : 'আর নয়।'
তখন গাছ-গাছালি, ঘাসপাতায় শিরশিরিয়ে
হাওয়া উঠবে,
সমস্ত তিক্ততা, সব রুক্ষতা পারদের মতো
ভারি হ'য়ে গড়িয়ে যাবে, তলানি হ'য়ে
জ'মে থাকবে ঢের নিচে, বালি, পাথর,
কাঁকরের গায়ে গা মিলিয়ে। উপরে খেলবে
হালকা স্বচ্ছতার স্রোত—উপরে তরঙ্গিত
হাজার সূর্যের বাঁকা ছুরি—শুচিতার ঢেউয়ে
গা ভাসিয়ে, পাতিহাঁসের মতো নিশ্চিন্তে
আমি তখন ঘরোয়া জলে নেমে যাবো।

কুকুর

কোনো রাতে অন্ধকারে অবিরত তালা খুলতে-খুলতে
টুলটাকে মনে হয় বশংবদ বিলেতি কুকুর
আমার আত্মাতে যার মৌলভাবে কোনো লাভ নেই।
নিজের মনিব যার নিকটেই নেপথ্যে কোথাও,
অঙ্গুলিহেলনে তাঁর নিমেষ-মধ্যেই নির্ঘাৎ
কণ্ঠলগ্ন হ'তে রাজি সে অবশ্য যে-কোনো জীবের।

তুমি, আমি, আমরা যে-কেউ—
কুকুর পুষিনি যারা সদরে-অন্দরে কোনোদিনও,
তার মর্ম বুঝবো না ঠিক।

ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকে অন্ধকারে কোনো কোনো রাতে
টুলটা, নির্লোভ, যেন বশংবদ শিকারি কুকুর।

গৃহস্থালি

এ এক বিচিত্র পরিবার।
সুগৃহিণী হৃৎপিণ্ড সারা দিনরাত
পরিশ্রম ক'রে চলে বিরতিবিহীন
যদিও একাকী নয়, সঙ্গে আছে ভৃত্য-পরিজন
স্নায়ু, পেশি, শিরা ও ধমনী—
অথচ কী স্বচ্ছন্দ, মুক্ত, ঝকঝকে হিশেবি সংসার!
পেশিরা নিষ্কাম কর্মী,
সদাব্যস্ত যে যার ধান্দায়।

কিন্তু সারা দিনরাত, বিরতিবিহীন
ফাঁকি দিয়ে, গুটিসুটি, চিলেকুঠুরিতে
নিষ্কর্মা, আলস্যপুষ্ট, ঘোর নেশাখোর
গৃহস্বামী—
মস্তিষ্ক ঘুমায়।

অন্যেরা

আমি চেয়ে-চেয়ে দেখি, কী অবলীলায়
অন্যেরা বাগান করে। দোরের গোড়ায়
জমির টুকরোখানি নির্ঘাৎ জড়ায়
বাহারি পুষ্পের জালে, হেলায়-ফেলায়।

শুধু আমি ঘেমে নেয়ে কাস্তে কাঁচি শাবল চালিয়ে
প্রাণপণে যুদ্ধ করি, ফুল তবু বেড়ায় পালিয়ে।

যখন আমার সঙ্গে সমুদ্রের ভয়াল সংগ্রাম
তখন অন্যেরা দেখি নুলিয়ার মতন নিপুণ
তরঙ্গ-কেলিতে মত্ত অট্টহেসে। মুখ ক'রে চুন
আমিই কেবল প্রাণ ঠোঁটে নিয়ে তীরে উঠলাম।

শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখি, কী অবলীলায়
অন্যেরা নিশান রাখে নতুন টিলায়।

স্পন্দন

'স্পন্দন' শব্দের অর্থ
তার কাছে সেদিন হঠাৎ
পালটে গেলো। যেমন গভীর
তুষার ফাটিয়ে, ছোটো নীল ফুল একলা প্রথম
ভীষণ সাহস করে, হঠাৎ যেমন
পুরোনো স্মৃতির মতো একফালি আলো
মুখের পাশটিতে পড়ে।

শব্দেরা চপলমতি, লক্ষ্মীর মতোই
ঘর থেকে ঘরে-ঘরে ঘুরে
চরিত্র বদল করে, এবং হৃদয়।
'স্পন্দন' শব্দের মুখ
হঠাৎ তুখোড়
পাওনাদারি কায়দায় হাজির সদরে—
জন্মান্তের জমা হওয়া ঋণের দলিল
অকস্মাৎ পুরো তার বগলদাবাতে।
'স্পন্দন' শব্দের কাছে
অতএব, এ-জন্মের মতো
দাসখৎ লেখা হ'য়ে গেলো সেই স্বাধীন মেয়ের।

অন্তরা

১

অন্তরা, উদিত হ'লি আদি জলরাশির অন্তরে
প্রথম সূর্যের মতো চিরনব, চিরপুরাতন—
আমাকে বানালি বিশ্ব,
হাত ধ'রে হেঁটে গেলো সার দিয়ে আমার ভিতরে
ক্রমবিবর্তনমান ইতিহাস ও প্রাগৈতিহাসিক,
অন্তরা, তোমারই পুণ্যে আইনত প্রবেশ পেলাম
পূর্বপুরুষের দশমহলা অন্দরে

এখন তোমার দুটি কচি হাত মুঠোয় জড়িয়ে
ভবিষ্যৎটাকে আমি করেছি আমারই কাছে ঋণী

অন্তরা, ত্রিকাল তুমি মুহূর্তেই দিয়েছো ভরিয়ে
তোমার কল্যাণে আমি ধরিত্রীর সমবয়সিনী !

২

কী তুই আশ্চর্য মেয়ে একরত্তি পিকোলো আমার
আনন্দকে করেছিস বশংবদ ছায়া শরীরের—
যেদিকে ফেরাস মুখ, ফুটে ওঠে খুশির কদম
বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি, সোনামণি পিকোলো আমার:
এমন আনন্দে তুই দাবি পেলি সুবাদে কিসের ?
যেদিকে খেলাস মুঠি, ধরা পড়ে হাসির ফানুশ
কী তুই আশ্চর্য মেয়ে যাদুকরী পিকোলো আমার
নিশ্চিন্তে ঠেলিস পায়ে সব দ্বন্দ্ব শুভ-অশুভের !

৩

আমি তো এখানে আছি প্রতীক্ষায় এখনো তেমনই
তবে কেন স্বপ্নে তুমি রোজ কেঁদে ওঠো
কেন ভয়, এত ভয়, নিদ্রার কাঁথায়
যাকে মুড়ে রাখা যায় না ! সময়-বেহুঁশ
আমি তো এখানে আছি পাহারায় আজিও তেমনই

কার বনে তুমি পথ হারালে হঠাৎ ?

১৫ এপ্রিল ১৯৬৪
নয়া দিল্লি

৪

ছোট্ট একটা ছবি সেঁটে রেখেছি
আমার রান্নাঘরের দেওয়ালে।
নীল আকাশে কচি-কচি তারের ডালপালা
তাতে চিকন চারটি তারের পাখি দিয়ে
একটা যন্ত্র তৈরি ক'রে, তার গায়ে
মস্ত এক হাতল লাগিয়েছেন শ্রী পোল ক্লে
যেন ঘোরানো মাত্রই
এই লম্বা-লম্বা তারের জিহ্বা খেলিয়ে
কলকল ক'রে উঠবে তাঁর পাখির যন্তর।
নাম রেখেছেন : কাকলিযন্ত্র, The Twittering Machine!

ছবিটা দেখলেই আমার তোর কথা মনে পড়ে
কচি-কচি চারটে তারের পাখি ব'সে আছে
তোর মধ্যে, আর হাতলটা তোর দশ আঙুলে
বন্দী। আধো বুলি ফুটতে-না-ফুটতেই
খই ফুটিয়ে ব'সে আছিস
আমাদের তৈরি-করা কাকলিযন্ত্র,
তুই —
নীল আকাশ ব্যেপে।

৫

কোনোদিন মৃত্যু হবে এই শিশুটিরও।

এই যে দুধের শিশু, যাকে আমি প্রাণের আয়াসে
যাকে আমি পৃথিবীতে বহু সাধনায়
আমি যাকে আনলাম। এবার আমায়

সে যদি জিজ্ঞেস করে : 'কিসের আশ্বাসে
আমাকে এনেছো এই ঝলমলে আজব আলয়ে,
কোন মহৎ উৎসবে আমি যোগ দেবো, যাবো ?'
আমি ম'রে যাবো ভয়ে।
ভয়ে আমি ম'রে যাবো, আমি অজ্ঞতায়
চেতনাবিলুপ্ত এক অন্ধকার শূন্যের গুহায়
দৌড়িয়ে পালাবো।

তোকে আমি কী জবাব দেবো !

গোচর

রোমন্থনে কাজ নেই। এখন চরার জমি চাই।
যদিও পরিচ্ছন্ন, ধুনো-জ্বালা, নিকোনো গোয়াল,
চোয়ালেরও ক্লান্তি আসে। যদিও বৎসলা,
হৃদয়েরও ক্লান্তি আসে।
রোমন্থনে সুখ নেই—
গোষ্ঠরাজ, অনুমতি করো, আমার চরার জমি চাই।

মশারি

তুমি এখন আমস্টারডামে, নাকি মেক্সিকোয় ? তুমি
এখন ভূমধ্যসাগরের আকাশে, নাকি অতলান্তিকের
ঢেউয়ে নাচছে তোমার হালকা ডানার ছায়া—নাকি
তুমি আস্তে শুয়ে আছো ম্যানহ্যাটানের কোনো
পঁচিশতলার পালঙ্কে ? মোটমাট তুমি এখন

কলকাতাতে নেই। কিংবা শান্তিনিকেতনেও না
মোটকথা, মশারির মধ্যে আমি আর
এক-মশারি রক্তখেকো মশার পিন্ পিন্ পন্ পন্।

বেস্পতিবার

ভেবেছিলাম বেস্পতিবার যাবো। তারপরেই কাজ প'ড়ে
গেলো। বুধবার তোমার অফিস। সোমবার ছেলেটার ইশকুলে
পুরস্কার-সভা, আর মঙ্গলবারে বুঝি ভাইঝির আশীর্বাদ ছিলো।
শুক্র-শনি মাসশাশুড়ি এলেন। আর রোববারেই তুমি
চ'লে গেলে।

পুষ্পিত প্রহার

তুমি মেরেছিলে ব'লে আজ আমার ফুলন্ত বাগান
প্রতিটি আঘাত কাঁপে কণ্টকিত কেতকীর ঝাড়ে
গোলোক চাঁপায় ঝরে সকালের অশ্রুজল যত
শোণিতাক্ত কৃষ্ণচূড়া জ্ব'লে ওঠে বসন্তবাহারে।

কোনোখানে লেখা নেই সেদিনের বিস্মৃত বানান
সমস্ত বেদনা এক পুষ্পময় প্রহারে সংহত।

আরেক আকাশ

'সব আলো ফিরে দাও, সব রঙ, সকল উত্তাপ—
আমি সব বেঁধে নিয়ে আরেক আকাশে যাবো আজ…'
এই ব'লে ফুর্তিভরে নবোদ্যমে সূর্য মহারাজ
পাপপুণ্য মুছে নিয়ে শ্লেটে শুধু লিখে অভিশাপ
চ'লে গেলো অচিন আকাশে।

হাসিমুখে পাশে-পাশে
আজন্মের বন্ধুরা সকলে
চন্দ্র, তারকারা গেলো চ'লে।

আকাশগঙ্গা

বৃথা ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আকাশে তাকাও।
পবিত্র, বিমুক্ত, বৃক্ক, অশোক আকাশে
সিন্ধুর সাযুজ্য ছাখো, তরঙ্গিত তারা
একে-একে দুলে উঠবে।
আকাশে তাকাও
মধ্যরাতে দিবারম্ভ এ-হেন বিদেশও
সহসা বাজাবে ঘণ্টা অকালবোধনে।

অস্থায়ী নোঙর

এখন অবেলা নয়, পাতা ঝ'রে-ঝ'রে
এনেছে বৈরাগী রঙ মধ্যাহ্ন-বাতাসে
সেতুর ছায়ায় কাঁপে অলস প্রহরে
নদীর বিস্রস্ত বুক। সুষুপ্ত প্রবাসে
বিদেশী নৌকোর হাল, অস্থায়ী নোঙরে।

সমুদ্র

পুনশ্চ সমুদ্র সত্য। সিন্ধুর ডাকেই
বারংবার সাড়া দিয়ে জেগে উঠি। নেই
কোথাও স্বপ্নের নেশা। সমস্ত বাস্তব
একটি তরঙ্গতৃপ্ত সমুদ্রের স্তব।

ফেরা

অনুতাপে ফিরবে না। ফিরবে না লুকোনো কান্নায়
কাঠ, বালি, প্রস্তরের অত্যাশ্চর্য জাদু মহিমায়
মিশে গেছে বিস্মৃতির অচেনা দেয়ালে।
কখনো ফেরানো তাকে যাবে না প্রয়াসে।
যে ফেরার, সে নিঃশব্দে নিজে ফিরে আসে
যুক্তিহীন—কালের খেয়ালে।

তখন সমস্যা তাকে ঘরে তোলা নিয়ে।

আবার চড়ুই

আমাকে বোলো না তুমি পরী হ'তে আর।
আমি পরী হ'তে আর পারছিনে কোনো প্রহরেই।
চন্দ্রালোকে ভয় করে, নির্জনতা বিষম ওজন···
দোহাই তোমার !
আমার হৃদয়ে আর জ্যোৎস্না বাকি নেই
সূর্যালোকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে মন···
আমাকে
চড়ুই
হ'তে দিয়ো।

দোলনপদ্ম

শঙ্কাহীন আশাবাদ যদি
প্রথম শ্রেণীর মন ব্যক্ত করে, আমি
প্রথম শ্রেণীতে নই। আশা
আমার দূরের দ্বীপে জ্বলন্ত, তবুও
পথে দুরূহ সমুদ্র, নদী।

পুনঃপুন রওনা হ'য়ে ফিরে আসি।
আমার ক্ষিতিজ ভালোবাসা
দ্বন্দ্বের দোলনপদ্মে শাশ্বত শিশির।

যেহেতু বিকেলে, সূর্য ডুবে গেলে প্রাণ
আপনি স্তিমিত হয় মনে—
যেহেতু আবার, সকাল পর্যন্ত ভীত
প্রার্থনায় ভিজি সংগোপনে,
তাই পথ ঋজু নয়, গোল। বারংবার
রওনা দিয়ে, ঘরে ফিরে আসা।

ধ্রুব-অধ্রুবের দ্বন্দ্বে দরিদ্র, দুর্জ্ঞেয় ভালোবাসা।

চড়ুই

কোথাও যদি হঠাৎ অসময়ে
অবোধ কোনো চড়ুই ডেকে ওঠে
অমনি তুমি ব্লুমিংটনে নেই।

ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির বাসা
খড় ছড়িয়ে ময়লা করে মেঝে
মায়ের চাবির আঁচল, চুড়ি বাজে।

ঘড়ির কাঁটায় রাত্রি, তবু পাখি।
নাছোড় হাতে প্রলম্ব গোধূলি
আঁকড়ে থাকে ব্লুমিংটনের মাটি।

আজকাল আর বিদ্যুতে নয় ঝড়
বজ্রপাতে আকাশ অদরকারি
ঘরের কোণে মাদুর পেতে ব'সে

প্রলয় এবং ইন্দ্রপতন ঘটে।
যে-কোনো দোর, নাড়লে কড়া, খোলে
ক্লান্ত লিয়র, কেরানি হ্যামলেট।

সেদিক থেকে ভাবলে, দ্যাখো, তুমি
দিব্যি আছো। যদিও ঘরে নয়,
হাতের কাছে জানলা খুলে,—পাখি!

শাদা পাখি

শাদা পাখি ওড়ে শহরে
জানলায় পাতা পাতায় আকাশ আকাশে জানলা শহরে

শাদা পাখি নাচে মাঠের মেঝেয়
পাটল পোকার নাটের মেঝেয়
পাতায় আকাশ আকাশে জানলা জানলায় পাতা শহরে

শাদা পাখি নাচে
পাটল পোকার নাটের মাঠেতে শহরে
ওড়ে শাদা পাখি শাদা পাখি ওড়ে
শাদা পাখি বাঁধা শহরে
ইট পাতা পাখি ইঁদুর সিঁদুর
হাতা বেড়ি ছাতা চাদর মাদুর
রান্না কান্না আপিশ আলনা ভেজাল জালনা শহরে

ওড়ে শাদা পাখি পাখি চাই পাখি
বাঁধা পাখি শাদা শহরে
ধাঁধা শহরে
খেলে পাখি খাঁ খাঁ শহরে
বাঁকা শহরে।

প্রাসাদে

এদিকে বাগান ওদিকে সিঁড়ি
চারিদিকে খোলা বাতায়ন
আর বাহারি পাতা
পাতানো জানলা পাতানো বাগান
পাতানো সিঁড়ি
আর চারিধারে আসন পাতা
থামের এপাশে থামের ওপাশে
লুকোচুরি খেলি, আসন পাতা
এদিকে তাকিয়া ওদিকে বালিশ
ফরাশ বিছোনো, সোনার থালা—
সোনার পিদিম লুকিয়ে জ্বালা
পাতানো ফরাশ বিছিয়ে পাতা
হঠাৎ কোথাও ছাদ ফেটে গিয়ে
টুকরো-টুকরো আকাশ ঢালা
আকাশ মাখানো আকাশ পাতা
এলোমেলো কত আকাশ রাখা
বসবে ? যাবে কি ? থামবে ? তাকাবে ?
সিঁটকোবে নাক ? উঁচোবে ভুরু ?
ধরবে বরফে তাতানো গেলাশ ?

আপ্যায়নের সবে তো শুরু—
তর্কাতর্কি—বিষম বচসা—
অসীম যুক্তি—অপার খেলা
বুদ্ধি মোটা, কি বুদ্ধি সরু ?
এদিকে ফরাশ ওদিকে বাগান
চারিদিকে সিঁড়ি আকাশ ভাঙা
চারিদিকে খোলা বাতায়ন ছাখো
চারিদিকে থাম, বাহারে, ঢ্যাঙা—
মন ঠিক করো, মন ঠিক করো
বসবে ? যাবে কি ? এড়াবে ? আহা !
বড়ো মুশকিল ! এমন প্রাসাদে
পিঁপড়ের বাসা কেন যে বাঁধা !

ময়লা ফেলার টিনে কুকুরছানা

এখন তো জেনেছিস সব ।
ও-হাড়টা হাড় নয়, আর ওই বিশাল আকাশ
কঠিন ঢাকনা মাত্র ।
আর কোনো পথ নেই
যতবার ওই তোর রাঙানো আকাশ তোলা হবে
ততবার পাশ বুঝে যুঝে যাওয়া ছাড়া ।

এখনো দ্যষবি তোর ভিজে, কচি নাক
সুরভিত আবর্জনায় ? পেট ভরবে না—তুই
যতই মানিয়ে নিস তোর ভূমিকায়
সব লক্ষ্মী কুকুরের উচিত যেমন ।
চিরকাল গোনা যাবে পাঁজরাগুলো তোর

চিরকাল থিকথিকে পোকা ঘুরবে গা-য়
কোনদিন ছাইয়ের গাদায় তুই পিষে ম'রে যাবি।

কেঁদে কোনো লাভ নেই। ওরা সব জানে। তোকে শক্ত হ'তে হবে।
ঠেলে ফেলে দিতে হবে দুশমন লোহার আকাশ
তোর কচি নাক ফেটে রক্ত ঝ'রে ক্ষত হ'য়ে যাক—
তবু—
ছোট্ট কুকুর, তুই দেখছিসনে, ফাঁদে পড়েছিস?

তরু

নেভিল্‌স কোর্টের চেস্টনাট

বৃষ্টিতেই মুছে গেলো শাখা থেকে বসন্তের লেখা
মাটিতে লুটোলো রাঙা কিংখাবের মঞ্জরিত শাড়ি
আবার দাঁড়ালো তরু পুরোনো প্রচ্ছদে পুরো একা
শ্যামল রাত্রির দিকে আবার আরম্ভ হবে পাড়ি।

যেমন সর্বাঙ্গ সঁপে উজ্জ্বল ফসল ফলেছিলো
অকালবর্ষণে তার ভেসে গেলো সর্বস্ব তেমনই—
স্মৃতিতে কি কষ্ট পাও, তরু, কোনো বসন্ত উর্মিল
দূরের উদ্যানে শুনে পরকীয় মৌমাছির ধ্বনি?

সন্ধ্যামাধবী

অনেক শাদা মেরু পেরিয়ে, এবার
সবুজ পাতা, বেগুনি লাইলাক।
বসন্তের কারিগর জাঁকিয়ে বসেছে। সেই কখন

ভোর হয় আর সারাদিনের শেষে
আলো-আলো সন্ধে হয়, আস্তে-ধীরে
সইয়ে-সইয়ে সন্ধে নামে, সসংকোচে ;
নববধূর দ্বিধায়।   হাওয়া বয়
ঘাসের গন্ধে, হাওয়া বয় পাতার গন্ধে, হাওয়া
মাঠে গড়াগড়ি দিয়ে রঙিন আলো মাখে,
অঢেল সময় ছিটিয়ে-ছড়িয়ে
ওদের খেলার টিমে তেতালা।
হাওয়া বয়, সন্ধে হয়, হাওয়া বয়, সন্ধে হয়, হয়

গ্রহের অন্যপ্রান্তে তখন চেনা সূর্য শশব্যস্তে উদয় হচ্ছেন।

অন্যদেশ

এ-রাজ্যে বিকেল নেই।
নীরন্ধ্র দুপুর সব বিবর্ণ রাত্রির তীরে ডোবে
অল্প-স্বল্প সকাল গড়ায়
তারপরই পায়াভারি বিষম দুপুরবেলা আসে।

নীরন্ধ্র দুপুর, আর নিদ্রাহীন রাত্রি দ্বিপ্রহর
এই দুই মেরু ছুঁয়ে ছোটো-ছোটো পল-অনুপল
অনর্গল দৌড়োয়
সারি-সারি জরুরি পিঁপড়ে
গর্তের এপারে-ওপারে
বিরামবিহীন।

হায় শব্দ

ডাকলেই আসে না তারা
প্রচলিত ঈশ্বরের করুণার মতো—
চাই লগ্ন, চাই মতি, অন্তত খেয়াল

শব্দেরা দাঁড়িয়ে থাকে
ঠিক যেন আকাশের গায়ে
সূর্যাস্তের অসম্ভব বর্ণাঢ্য বিনয়
অসংলগ্ন, অধরা, একাকী—
অথচ সযত্নে যেন ছুঁয়ে আছে সপ্রেম আঙুলে
বশংবদ ধরিত্রীর উতল কুন্তল।

আহা, যেন চৌরঙ্গির স্টুডিওর ফ্রেমে
আদর্শ দাম্পত্য চিত্র। অথচ ভিতরে
আদৌ চেনে না তারা পরস্পর কে বা কার মুখ
কখনো রাখবে না মনে
মুদ্রার মোহনে বাঁধা মুহূর্তের মডেল দু-জন।
তেমনিই শব্দেরা থাকে—
মস্তিষ্কের চুড়োয়-চুড়োয়
গোলাপি সূর্যের শিখা।
দৃষ্টিপাতে চকিতের হোলি—
কিন্তু ওই পর্যন্তই।
বরফ গলাবে, এমনই উত্তাপ দেবে,
এত কাছাকাছি হবে,
খবরদার ভেবেছো কখনো! কোঁচার ফুলটি
আঙুলে সাপটে ধ'রে শব্দের বাবুরা
কলমের কর্দম এড়িয়ে চড়েন
কল্পনার ল্যানডোর পাদানে।

দর্পণ

আকাশে থরোথরো আলোর কাঁপা ঢেউ
আঁধার-তরণীরা সহজে তোলে পাল
একদা যে-কথাটি শোণিতে গাঁথা ছিলো।
অদ্য সে-শপথ স্বয়ং ফেরালাম।

একটি ঘন আশা জীবন-মস্থিত
আজকে যামিনীতে মিথ্যা হ'য়ে যাক
যে-পথে হেঁটে এসে এ-নদী ছুঁয়েছি, সে-
পথের দিশা নেই, বালির জঞ্জাল।

ঘোষণা করি তবে অশ্রুহীন চোখে
দর্পণে যে-মুখ দেখেছি আমি আজ
জাত সে পিঞ্জরে, আকাশে ভয় তার
খাঁচাতে ফিরে যেতে রাজি সে সুতরাং।

প্রাথমিক

আবার আমারে কেন অরণ্যের পুরোনো আঁধারে
অলক্ষ্যে এনেছো একা আশ্চর্যের অলীক আশ্বাসে !
আমি তো জেনেছি সবই, আবাল্যের অভ্যস্ত খেলায়
আমারে কেমনে তুমি যুগান্তরে আবার ভুলালে !

পুনশ্চের পুরাবৃত্ত সম্পূর্ণ অধীত ছিলো বটে
তা সত্ত্বে কী-ভাবে ঘটে এবংবিধ সুজীর্ণ প্রমাদ
কারণ অবোধ্য আজও ! পরিচিত প্রাচীন ঠাট্টাতে
আবার, আশ্চর্য ! তুমি কোন ছিদ্রে ভুলালে আমায় !

চেনা কুল গাছ, সাঁকো, মন্দিরের চেনা ঘণ্টাধ্বনি
চেনা মাঠে সিধে রাস্তা পাড়াটিতে পৌঁছুবে সহজে
এ-ই জানি চিরকাল। তবু তুমি আবার আমাকে
ভুলায়ে অরণ্যে আনো আশ্চর্যের অলীক উদ্ভাসে।

সূর্যাস্ত

'দেখেছিলে, গতকাল কী আশ্চর্য সূর্য ডুবে গেলো ?'
প্রশ্ন তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা—
গর্ভের অস্ফুট কান্না ভূমিস্পর্শ ক'রেই মিলালো।

মুক্তি নেই। অদ্যাবধি আকাঙ্ক্ষায় বেঁচে আছে সব।
সহস্র আলোকবর্ষ পার হ'য়ে স্মৃতির চারণ
সেই চন্দ্র : শব্দময় হয়েছিলো গঙ্গার ওপারে।

সেই চন্দ্র অস্ত গেছে কতকাল, গঙ্গার ওপারে—
এখন ধমনি ছিঁড়ে শোণিতাক্ত সমুদ্র মন্থন
শব্দ ও দৃশ্যের ঝঞ্ঝা, কর্ণভেদী বর্ণ-কলরব।

জলকেলি

সামনেই ডুবে গেলো ঝড়ে-জলে চেনা নৌকোখানা
কখনো কি দেখা হবে, জলের তলার নীল দেশে ?

কখনো শৈবাল হ'য়ে আবার জড়াবো
ওই বর্ণহীন, নগ্ন, নিমগ্ন কঙ্কাল
কে ভেবেছে,— এইভাবে নবীন, জান্তব
এমন অখণ্ড হবে জলের তলার জলকেলি ?

পথে-ঘাটে

বন্ধুকে তোমার কথা বলবো ব'লে সকালবেলায়
রাস্তায় বেরিয়ে কার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো কোন
চায়ের দোকানে চ'লে গিয়ে কথায়-কথায় বেলা
গড়ায় আজেবাজে কত কথায় বেলা গড়ায়
মস্ত এক তামাশা হ'লো বিরাট ভিড় জমলো পথে
অমন ভিড়ে কোথায় আমি আর রাস্তাগুলো
এলোমেলো অলিগলির ফাঁকে দৌড়ে এদিক-ওদিক
পালিয়ে গেলো বেলা নোংরা বেড়াল একলা
ফিরে এলো রান্নাঘরে তখন পাতের এঁটো-কাঁটাও
নেই।
পায়রাগুলো ঝাঁকের পাখি সময় হ'তেই উড়লো
নিয়মিত— বিকেল হবার শব্দ শুনে ফিরতে
চেয়ে দেখি পকেট কাটা। তোমার কথা
পকেটে আর নেই।

খেলুড়ে

জানলা দিয়ে তোমাদের দেখে
আমারও খেলবার সাধ হয়
তোমরা সব দল বেঁধে পথে খেলা করো।
আমার শৈশবসঙ্গী তোমাদের প্রিয় মুখগুলি
কাচের শার্শির ফাঁকে আরো যেন কচি
নীল পর্দা উড়ে-উড়ে পড়ে
লতাপাতার জঙলা ছায়া ঘরেই অরণ্য ব'য়ে আনে
চলতি গাড়ির আলোয় স্থাণু দেওয়ালটা কেঁপে যায়
তোমাদের খেলার শব্দে
কান পেতে রাখি।
কাচের পিছন থেকে সাধ হয়
আমার এখনো।

ডুমুর

আবার যদি ফিরতে চাই এই দরদালান
এই বাগানকুঠি ছেড়ে তোমার ঐ ডুমুর গাছের
ছায়ায়, বন্ধু, তুমি কি আমাকে জায়গা ছেড়ে
দেবে ?
পথের শেষ নেই, এই দরদালান অনন্ত, এই
বাগান সীমাহীন, এতগুলো থাম তুমি জন্মেও
দেখোনি, এত শিউলি, এত যুঁই, এত আম,
জামরুল, এত আমি—এ তোমার সবগুলি
চোখ একসঙ্গে মেলে দিলেও ধরা পড়বে না,
এত পায়রা আসে এ-বাড়ির ছাদে, এত
খরগোশ এ-বাগানের গর্তে-গর্তে, বন্ধু, তোমার

ডুমুর গাছের ছাউনি থেকে তুমি এর কণাটুকুও
জানতে পাবে না—এত বুড়ো-বুড়ো কালবোষ
এদের কালো দিঘিতে !

সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, দিনরাত পথ চ'লে.
দিনরাত দিনরাত সব পথ একা চ'লে-চ'লে
যদি আমি ফের ফিরতে চাই, বন্ধু, তোমার
ডুমুর গাছটি কি আমাকে ছায়া দেবে ?

তুমি ওই অদৃশ্য মিনারে

দেখলুম, তুমি কী রকম
আমার ঘাসের জমি থেকে
বাতাসের ধাপে-ধাপে চরণ ঠেকিয়ে
অদৃশ্য মিনারে উঠে গেলে ।

দেখলুম তুমি সেই মিনার-চূড়োয়
সোনালি মেঘের তুলি দু-গালে বুলিয়ে নিয়ে
সূর্যের আঙুল ছুঁয়ে শপথ জড়ালে

আর আমি অকস্মাৎ পাহাড়ি রাস্তায়
ধ্বসের সোয়ারি হ'য়ে যেন
দুঃসহ গতিতে পড়ছি
পাক খেয়ে অনন্ত কন্দরে···

প'ড়ে যেতে-যেতে আমি দেখলুম
তুমি কী-রকম আস্তে বাতাস মাড়িয়ে
সূর্যের পাড়ায় উঠে গেলে ।

যৌবনের দোহাই ! তুমি যেয়ো না

অসম্ভাব্য মনে হয় যৌবনের অন্তে বেঁচে থাকা
তেমনই সম্ভব নয় তুমি গেলে যৌবন বাঁচানো ।
তোমাকে ডাকি না, তবু মনে জানি তুমি ঘরে আছো
দেখি না তোমার মুখ, তবু মুখচ্ছবি মনে ভাসে ।
যদিও অযোগ্য আমি—ভাঁড়ারের ভিখিরি ইঁদুর—
জানি তুমি করুণায় একচ্ছত্র এখনো আমারই ।

কবিতা, তোমাকে ছেড়ে কতকাল বেঁচে-ব'র্তে আছি !

তা-ব'লে আমাকে কিন্তু তুমি ছেড়ে থেকো না, আমাকে
তোমার বুকের মধ্যে হেলায়-ফেলায় পুষে রেখো ।
তুমি ঘর ছেড়ে গেলে আমি কোন বানপ্রস্থে যাবো !

কখনো ভালোবাসা

ডাকলে আসে । পোষা কাকাতুয়ার মতো
আঙুলে এসে বসে । ফরফরায় ।
ঘাড় দুলিয়ে, পালখ ফুলিয়ে, ঝুঁটি নাচিয়ে
বুলি কপচায় । মন-রাখা বোল পড়ে
আমার ধবধবে পাখি, আমার মন-রাখা
যত বুলি, যত শেখানো-পড়ানো বুলি,
আমার কানে মধু ঢালে ।
তারপর আড়ালে
একা
দাঁড়ে ব'সে-ব'সে

নিজের মনে-মনে
আমার ধবধবে পোষা পাখি
ঝকঝকে শেকল বাজিয়ে অট্টহাসে
আর মহাশূন্যে
পালখ খশায়।

স্বাগত দেবদূত

এমন কখনো হয়। এমনও কখনো হয়
বিশাল কাচের মতো নীল চোখ নিস্তব্ধ আকাশ
হঠাৎ সর্বস্ব ঢেকে জোর ক'রে ঘরে ঢুকে আসে
কোনায় আগুন জ্বলে, তাক-ভরা বইপত্র
বিছানার রঙদার চাদর ছাপিয়ে
নৈঃশব্দ্য ঢুকে পড়ে, পাহাড়ি মেঘের মতো, ঘরে।
কাচের বাকশের মধ্যে প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা
তৎক্ষণাৎ দোকানের লোভনীয় তাকে উঠে বসি—
এখনো জোটেনি ক্রেতা, প্রতীক্ষায় পৃথক সকলে
কাচের ঘরের মধ্যে প্রত্যেকেই একা, দৃশ্যময়,
অস্পৃশ্য, সুদূর। এমন স্তব্ধতা আসে,
এমন স্তব্ধতা ভাসে, পাহাড়ি মেঘের মতো
ঘরে। অথচ আগুন জ্বলে কোণে, তাক-ভরা বই,
বিছানায় রঙিন চাদর।
চারিদিকে কত চোখ, ভাষাহীন,
যেন কার ফুলের বাগানে ব'সে আছি
হাওয়া নেই—মুহূর্তেই সব ফুল কাগজের
বিজ্ঞাপনী ছবি। এমনই নৈঃশব্দ্য ঢোকে
একঘর সামাজিক গরম বাতাস

পর্বতশিখরে চ'ড়ে অকস্মাৎ বিশুদ্ধ ও ভারি—
এত শুদ্ধ, শ্বাসকষ্ট শুরু হ'য়ে যাবে যেন
পলকে সবার। যেন নিচে, আশেপাশে, মুখ তুলে
মাথার ওপরে, কোনোদিকে কিছু নেই, শুধু মেঘ
শাদা মেঘ, স্তব্ধতার শূন্যতার বিপুল বিস্তার…
একটি বাক্যের শেষ, আরো একটি আরম্ভের আগে
মাঝে-মাঝে কী-আশ্চর্য স্তব্ধতার বন্যা নেমে আসে
হঠাৎ প্রত্যেকে যেন ভিন্ন-ভিন্ন টিলার উপরে
যোগাযোগশূন্য হ'য়ে প্রচণ্ড প্রলয়ে বন্দী আছি
যেন সব তারযোগ ছিন্ন হ'য়ে গেছে, সব সেতু ভাঙা,
সব রেলপথগুলো ভেসে গেছে ভয়াবহ বানে, যেন
কোথাও নগর নেই, গ্রাম নেই, লোকালয় নেই
যতদূর মন যায়, প্রাণ যায়, নিঃসীম এলাকা—
আসন্ন সংকটে বুঝি শ্বাসনালি রুদ্ধ হ'য়ে আসে…

এমন সময়ে
ঠিক দেবদূত যেমন স্বাগত
তেমনই উত্থিত হয় কোনো শব্দ।

ভয়ানক চেষ্টা ক'রে
একগলা জল ঠেলে-ঠেলে
সারারাত হেঁটে এসে কেউ
যেন এক প্রিয়ের সৎকার ক'রে গাঁয়ে ফিরে গেলো।
ভয়ানক চেষ্টা ক'রে
কেউ একটা কথা ক'য়ে ওঠে
কী-আশ্চর্য ইন্দ্রজাল—
উচ্চারিত শব্দ যেন মন্ত্রের মতন ত্রাণ করে—
মন্ত্রের মতন সব মৃত চোখ ত্রস্তে বেঁচে ওঠে
ফুলের বাগানে যেন হাওয়া বয়
কোনায় আগুন জ্বলে, তাকে বই, বিছানায় রেশমি চাদর

নিস্তব্ধতা এইমাত্র পথে নেমে গেছে।
পর্দা দোলে, উষ্ণ শুভ সৌহার্দ্যের বাতাস কাঁপিয়ে
শব্দ ঘোরে—ঘর ভ'রে দয়াময় শব্দ ঘোরে-ফেরে
ঘর ভ'রে শব্দময়ী করুণা ছড়ায়।

এবারে আরম্ভ খেলা

"For, from this instant/There's nothing
Serious in mortality ; /All is but toys."
Macbeth, II 3.

এ-মুহূর্ত থেকে শুরু ক'রে—
অতঃপর সব কিছু গৌণ হয়ে গেলো।
'নশ্বরতা' নামে আর গুরুভার পাথর কোথাও
আকাশ রাখবে না ঢেকে। এ-মুহূর্ত থেকে শুরু ক'রে
জীবনের সব কিছু অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলো।
এ-মুহূর্ত নিজেই একাকী যা-কিছু জরুরী সব
আকণ্ঠ নিঃশেষ করে নীলকণ্ঠ শিলা হয়ে গেছে।
এর পর আর কিছু ভার নেই, বিষ নেই আর,
ভয়, বা উদ্বেগ নেই, আর কোনো সর্বনাশ নেই।

এবারে আরম্ভ খেলা, এবার বেতরো খেলাধুলো।
এ-হাতে ও-হাতে লুফে সব ক'টা সুগোল বিশ্বাস—
অথবা দড়িতে হেঁটে, বার-ব্রতে, সৃজনে, বর্জনে—
এখন সমস্ত খেলা, এ-মুহূর্ত থেকে শুরু ক'রে—

অতঃপর সব ঘর পর্যবসিত খেলাঘরে।

উন্মথিত

কে বলে তোমার মতো সর্বস্বান্ত হয়েছি আমিও ?
"যারে ভালোবাসো তারে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে !
তাই শান্তি নেই ।" —এই অত্যন্ত সরল বাক্যবাণে
বিচূর্ণ বিদীর্ণ করে অন্তরাত্মা নিতান্ত অক্লেশে
না-হয় ঝরায় রক্ত, টুকরো করে শিরা ও ধমনী
না-হয় সটান্ ছিঁড়ে ফালি ফালি করে সব পেশী
না-হয় গুঁড়োয় অস্থি শূন্য শাদা ধূসর ধুলোয়
তা বলে কি বিনা যুদ্ধে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে পারি ?

এত সাধ্য রাধা-অঙ্গ কে দোলাবে তমালের ডালে
কেবা হেন দুঃসাহসী ? তোমাদের পোশাকী ঈশ্বর
আমার সংসারে বাঁধা চিরকাল অন্য অঙ্গীকারে ।
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জন্মলগ্নে আমাকে ঈশ্বর :
'তোমার আনন্দ কাড়ে হেন শক্তি রাখিনি সংসারে ।'
এখন তাকেই ডেকে হেঁকে বলবো : 'বুঝে নাও কড়ি
নৌকো ডুবু-ডুবু হলো, সুবাতাস ভরে দাও পালে ।
অন্তত দেখুক ওরা কার ভরসায় আমি লড়ি ।'

হিশেব

হঠাৎ বদলে গিয়েছে দিনরাত্রির অঙ্ক ।
এতদিন কষা হচ্ছিল যোগ আর গুণ
এবারে কষছি বিয়োগ আর ভাগ ।

এখন ভাবছি আর কী কী চাই না ।
আরো কী কী না হলেও বেঁচে থাকা যাবে
কী কী বাদ পড়লেও লোপ পাবে না জগৎ সংসার ।

দেখা যাচ্ছে, এক, দুই, তিন ক'রে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
ফেলে দেওয়া যাচ্ছে সব কিছুই।
অবশিষ্ট : বাতাস, যা নইলে সত্যি চলবে না,
বুকের ঘড়িতে দম দিতে চাই অক্সিজেন।
এছাড়া : পরিমিত ভিটামিন, প্রোটিন, কার্বো হাইড্রেট,
কিছুটা মিনারেল্‌স, আর
কিছুটা জল।

উড়াল

কালো থলিটার মধ্যে অন্তহীন নেমে যেতে যেতে
নিরন্তর ডুবে যেতে যেতে নরম বালির মধ্যে বিদ্ধমুখ
অন্ধকারে গেঁথে যেতে যেতে অপস্রিয়মান, ভারী
ভিজে, ঠাণ্ডা, মসৃণ বালির মধ্যে প্রোথিত হতে হতে
হঠাৎ উত্থিত হ'ল শুভ্র ধ্রুবতারা।
হঠাৎ একবিন্দু জ্যোতি ক্রমসম্প্রসরমান
শাদাবৃত্ত অকৃপণ স্তরে স্তরে ছড়ালো চৌদিকে
শুকনো হয়ে উড়ে গেলো ভিজে, ভারী, ঠাণ্ডা বালিয়াড়ি
ঈশ্বর, তোমার দৃষ্টি অন্তরের অন্তরালে পড়ে
সমস্ত অন্ধতা শুদ্ধ সততার জাদুমন্ত্রে মোছে, ঊর্ধ্বমুখী এখন উড়াল

অভিজ্ঞান

যদি বা মাছের পেটে চলে যায় অভিজ্ঞানটুকু-
অঙ্গুরীয়ে কি দরকার
স্পষ্টতই মনে আছে মুখ।
কেন চিন্তাকুল দৃষ্টি, ভ্রূধনু টঙ্কার
ললাটে কুঞ্চিত রেখাবলী ?
মহারাজ ! চিনেছো সকলি।

বৃথাবাক্য কেন ব্যয়, চলো শারদ্বত,
শার্ঙ্গরব, স্কন্ধে তোলো ক্লান্ত দণ্ডভার-
এ কোন্ রাজার দ্বারে হয়েছো বিনত ?
স্বপ্নাবৃত সমগ্র সংসার।

কখনো পড়লে মুখ মনে
হে প্রজাপালক,
চলে এসো চেনা তপোবনে
যেখানে সিংহের বুকে খেলা করে তোমার বালক ॥

প্রাপ্তি

এবারে নিজেকে পেলে।
কালান্তরী সমুদ্রের নিচে
রেখে এলে যৌবরাজ্য, সোনার মুকুট—
নগদ মূল্যের কড়ি গুনে দিয়ে রক্তে কড়ি খেলা।
অমূল্যে নিজেকে খুঁজে পেতে না কখনো।

অন্যের চৌকাঠে বসে গৃহস্থালি খেলা সারা হলো
এবারে নিজের ঘর গড়ো।
এখন নিজের হাতে নিজেকে নির্মাণ—
সদর্পে হরণ করো নিয়তির শাড়ি।

দর্পহারী রয়েছেন আড়ালে কোথাও—
প্রার্থনায় আসেন না, তাঁকে
ফাঁদ পেতে
ধরো ॥

এইকাল : চিরকাল

॥ হম্‌কো মিটা সকেংগে জমানামেঁ দম্ নহী ॥ গালিব

আমাকে নেবাতে পারে এতো শক্তি রাখে না সময়।
কখনো ভেবোনা আমি সময়ের মুখ চেয়ে থাকি।
সময় আমার সঙ্গে খেলে যাক যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা
যতোই কাড়ুক শাড়ি, লজ্জাবস্ত্র ঠিক থাকে বাকি,
মন্ত্রবলে বেলা হয়ে যাবে সব, যা ছিলো অবেলা

ধর্মযুদ্ধে প্রতিবাদী চিরকাল দাঁড়ায় নির্ভয়
যেহেতু স্বপক্ষে তার ঈশ্বর সাধিত মহাকাল
স্বয়ং সারথি হয়ে সব ব্যূহ ভাঙেন উত্তাল ;
যতই দিক না যুদ্ধ, খণ্ডকাল হবে পরাজিত
এই তো জেনেছি শাস্ত্রে, যতোটুকু হয়েছে অধীত।
অখণ্ড কালের পক্ষপাত—ধন্য আমি মহাশয়,
আমাকে রাঙাবে চোখ, এতো শক্তি রাখে না সময়।

নবান্ন

আমাকে ফিরিয়ে দাও কৌমার্যের ঘাড় বাঁকা ঘোড়া
ঋজু-শীর্ষ যৌবনের চণ্ডতেজ, দুর্বার সাহস
আমাকে ফিরিয়ে দাও প্রকৃতির স্বগত করুণা
যার সুকুমার বীজে চক্রান্তরে আবর্তিত রস
জন্ম দেয় নীল ফুল শীত ধৃষ্ট বরফ ফাটায়
হে প্রভু, মুড়েছি হাঁটু, প্রার্থনায় দুটি হাত জোড়া,
কৌমার্যের ব্রহ্মতেজে বারান্তরে জলুক মাটি এ
নোনায় বিধ্বস্ত ক্ষেতে ঝলসাক যৌবনের সোনা
আবার আরম্ভ হোক নবান্নের দ্বিতীয় মহড়া।

ইয়াং সি কিয়াং

বুকের মধ্য থেকে উঠে আসে চীনের প্রাচীর
রুদ্ধ করে দেয় সব। ছায়াপথ, বৃক্ষরাজি উপত্যকা
ঘন মালভূমি। বুকের মধ্য থেকে উঠে আসে
চীনের প্রাচীর। যুগান্তের অবরোধ।

তবুও ভাসিয়ে নেয় গ্রামের ওপরে গ্রাম
ইয়াং সি কিয়াং।

আমূল

মূল ধ'রে নাড়া দাও—
মাঝে মাঝে দু' আঙুলে শুধু
মূল ধ'রে নাড়াচাড়া করো—

তখন ভিতর দিকে গভীর অরণ্য ভেদ ক'রে
অতিবৃদ্ধ বটগাছ আমূল উৎক্ষিপ্ত হয়—
সমস্ত শিকড়
অস্থির মুষ্টির মতো মহাশূন্যে তুলে
পড়ে যায়—
নিঃশব্দ
বিশাল

পুরোনো মাটিতে
কুণ্ডের মতন গর্ত জেগে থাকে গভীর তৃষ্ণায়
আষাঢ়ের তিল-তুলসী চেয়ে······

প্রতিশ্রুত ছিলে, কিন্তু
উদাসীন সঙ্গম নয়, ভিতরে ভিতরে
নির্বিকার হত্যা শিখিয়েছো।

তত্রাচ, জীবন

তুমি জানো, পৃথিবীতে মানুষের প্রণয় থাকে না
পৃথিবীতে এমন কি শোকও
থাকে না, গলে যায়। এমন কি
স্মৃতিও অচির।

কবিতাও চলে যায়, সুতো ছেড়ে দিলে
মহাশূন্যে লাট খায়
পৃথিবী-সংযোগছিন্ন মহাকাশযান কোনো
যেমন নির্দিশা,
শূন্যলোকে অনন্ত বিরহী
কবি ভেসে যায়।

তত্রাচ জীবন থাকে, যেমন তেমন
যেভাবে রাখবে, তেমনি
কোলে-পিঠে নধর, নাদুশ,
অথবা জুতোর নিচে, বেপরোয়া—
কেবল জীবন থাকে শরীরে শরীরে
ভাঁড়ে কিংবা রূপোর গেলাশে

তুমি যতোদিন।

ভাসান যাত্রা

পাশ দিয়ে শঙ্খের মতন সব সামুদ্রিক জন্তু ভেসে যায়
কণ্টকিত নোনা জল, ঢেউ আছে ঢেউ নেই
গতিময় বিপুল স্তব্ধতা
কাণ্ডারী তোমার হাতে ছেড়ে দিই সব ভাসা, ডোবা—
হে কাণ্ডারী তোমার হাতেই
কখনো জলের নীচে অন্তর্হিত প্রবাল-প্রাচীরে

ঠেকে যেতে পারে ভেলা
ঠেকে যেতে পারে হাত হাঙরের দাঁতে
হঠাৎ উঠলে হাওয়া ভেলার ভাসান
মুহূর্তে বিলীন হতে পারে···
অতীব অস্পষ্ট দূরে নারিকেল পুষ্পিত সৈকত
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
ঢেউয়ের তলায় ছাখো সুনীল সবুজ
স্ফটিক শহরে নাচে মর্মরমূর্তির মতো পরী
তীর-বেঁধা সূর্যালোকে সুতীব্র তীর্যক
স্বর্ণ সমুজ্জ্বল স্বচ্ছ স্বপ্নালু সময় কাঁপে জলে
রামধনু মাছের ঝাঁক বর্ণাঢ্য শোভায়
সাড়ম্বরে বাঁক নেয় নৃত্যপর
দিগন্তের দিকে···

একদিকে আকাশ সীমা,
অন্যদিকে নীলাবনরাজি
কাণ্ডারী, তোমার হাতে তুলে দিই দিক্‌চক্রবাল
ভাসাও, ফেরাও, কিম্বা ডোবাও গভীরে··

পুতনার প্রতি

পুতনা তোমার সত্যি
কোনো দোষ ছিলো না কখনো।
তুমি শুধু ভাড়া-করা সামান্যা দানবী।

কী ক'রে জানবে তুমি, দেবশিশুদের
আকণ্ঠ রক্তের তৃষ্ণা ?
সদ্যোজাত দেবতার ঠোঁটে
তীব্রতর বিষ !

পুতনা, অকৃতকার্য হয়েছিলে বলে
আত্মাতে রেখো না ক্ষোভ—
তুমি তুচ্ছ নশ্বরী দানবী।

মৃত্যুহীন দেবতার দাঁতে
মারণাস্ত্র অমোঘ শানানো।

পদ্মার পাথর

গৃহস্বামী চ'লে গেলে অগস্ত্যযাত্রায়
মন্ত্রপূতঃ চৌকাঠ পেরিয়ে
পুরোনো জন্মের মতো ভালোবাসা, স্মৃতি ও শপথ
খুলে ফেলে দিয়ে—
লক্ষ্মীর ভিটেয় বয় পদ্মার গহন গেরুয়া।

বাদামি বাকল ছিঁড়ে নিলে
সব বৃক্ষে ভিতরের শাঁস
বিশুষ্ক হাড়ের মতো বর্ণহীন, শাদা।

নিজেকে তুই অন্ধ মূক বধির নির্বোধ
জন্মমৃত্যুহীন
অন্তর বাহির শূন্য পাথর করে নে।

ছাড়পত্র

নিজেই নিজের কাঁধে হাত রাখি,
গালে টোকা মেরে বলি : চীয়ার আপ্‌, ওল্ড গার্ল!
আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় না ইদানীং
বাতাসের স্বচ্ছতায় স্পষ্ট দেখি বানভাসি মুখ।

লাগাতার বৃষ্টি হয়ে সমস্ত দেওয়াল গলে কাদা।
কি সুন্দর চালাঘর, দোর, জানলা, আটচালা আছে
কেবল দেওয়াল নেই। কোথাও দেওয়াল নেই, ফাঁকা।
অকূল কোপাই নদী, অনন্ত খোয়াই খেলে ঘরে
ঘর-ভর্তি শালবন, চলে আসে আপ্‌ দানাপুর
ঘর ফুঁড়ে বৈতানিক, হেঁটে যায় বসন্ত উৎসব—
জ্যাজ শুনতে ভালোবাসো, বলো, একটু কফি কিম্বা চা—
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে।

কবোষ্ণ গালফ্‌ স্ট্রীমে নৌকো যায় কাশফুলদ্বীপে
ঘরে আসে টেন্‌বির স্মৃতিহীন নক্ষত্রের ঢেউ
রাইনের ওয়াইনারি, টিরোলের গ্রামীণ আকাশ
ঘরে সোজা ঢুকে পড়ে 'এল্‌ কামিনো রে আল' সড়ক
সতেরো মাইল স্বর্গ, নিসর্গীয় সীনিক ড্রাইভ্‌
ঝোড়োহাওয়া বিলি কাটে সাইপ্রাসের ডাইনি কালো চুলে
শ'য়ে শ'য়ে শীলমাছ প্রেমোন্মাদে ঘেউ ঘেউ ডাকে
আদিম অনন্ত শূন্যে ঝাঁপ খায় আলুথালু নায়েগ্রা প্রপাত
প্রত্যেক আটঘণ্টা বাদে মেঝেফুঁড়ে সমুত্থিত হয়
দুর্নিবার গন্ধক ফোয়ারা, মুহূর্তেই তিনশো ফুট, ফুটন্ত, ধূমল—

নিজেই নিজের কাঁধে হাত রাখি, বলি :
বুঝি কালান্তরে যাবে, ছাড়পত্র চাই ?

আইব্যাংকের উত্তমর্ণের প্রতি জন্মান্ধ

কে তুমি দয়ালু হে আমার চোখে এসে
নির্নিমেষ করো তীব্র দর্শন
অচেনা নয়নের নয়নমণি দিয়ে
একি এ প্রেতচোখে দেখাও সংসার।

ভয়াল খর-চোখ শকুনি-তীক্ষ্ণ
জগতে সব-কিছু স্পষ্ট খুলে যায়
মরণ-বাঁচনের সকলই একাকার
যতটা দেখবার—যা দেখবার নয়।

জন্ম-অন্ধ তো ছিলাম মন্দ না
ভিতরে যাই দেখি, দিব্য, নিরুপম—
এ কার পোড়া-চোখ পরেছি আমি কার ?
চিহ্ন মুছে গেছে, ইহ বা পরকাল !

দগ্ধ দেখে-যাওয়া বিদ্ধ করে সব
সদর-অন্দর প্রখর দৃশ্যে
শরীরে পুষি কার অনাত্মীয় চোখ
দৃশ্যাতীত ছায়া কোথাও নেই আর !

স্বপ্নহারা এই চণ্ড চক্ষুতে
জলছে, জ্ব'লে যায় অন্ধ অন্তর
চাইনে দৃষ্টির পরম রোশ্‌নাই
দে ফিরে জন্মের শুদ্ধ আঁধিয়ার।

অন্ধকার ঘর ছিলো জ্যোতির্ময়
ছিদ্রহীন ছিলো মোহন মণ্ডল
পুণ্যময় ছিলো বাতাস, ধুলোমাটি
নাও হে দয়া ফিরে—দয়ালু্‌ জহ্লাদ !

ধান্য

তুমি তো ছুঁড়েছো শেষ মৃত্যুবাণ
মরি নি তাতেও
এই দ্যাখো বেঁচে আছি
ধানক্ষেতে, শীষের ভিতরে।

তুমি তো নিরস্ত্র, শূন্য তূণীর তোমার
সমস্ত ছুঁড়েছো এই কুঁড়েঘরে,
বাদামী ছায়ায়—
আমার উদ্দেশে।

সমস্ত তীরগুলি ছুটে এসে
ধান ক্ষেতে আছড়ে পড়েছে
তীরগুলি ধানগাছে
মঞ্জরিত শীষ হয়ে গেছে।
তোমার কৃপায়
আমার ধানের ক্ষেতে প্রতি শীষে দুধ।

ইহকাল

এমনও দিন ছিলো
যখন সমুদ্র উদ্বেল
যখন তুড়ি দিলেই
আসতো ঘোড়া
বাজতো খুরে
রুপোর তোড়া
মেঘলা আকাশ
মেলতো ডানা
বাতাস এলোথেলো—

এই কি তবে ইহ?
যখন আকাশ জুড়ে
কুরুক্ষেত্র,
বাতাস জতুগৃহ?

বন্ধ্যা

এই যদি জীবন হয় ; জীবন-যৌবন,
আমার ও-বস্তুতে তবে কোনো লোভ নেই।
মা, তুমি ফিরিয়ে নাও স্বপ্ন ও স্মরণ,
কবিতা কল্পনালতা, সাতরাজার ধন
যা কিছু দিয়েছো, সব।
মাতৃস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি, বিজয়, বিস্ময়,
পুঁটলি খুলে অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দেবো
নাড়ীছেঁড়া রক্তমাংস। নিকষিত হেম।
রাশি রাশি স্বপ্নহারা দরিদ্র রয়েছে—
আমার স্বপ্নেতে তারা ভরুক হৃদয়।

এই যদি জীবন হয়, জীবন-যৌবন,
তাহলে তো বিজ্ঞাপনে আমাদের স্রেফ ঠকিয়েছে।

চোখ গেল

না দেখাটাই ছিলো ভালো
ছিলো ভালো
ভালো ছিলো
দেখা হলেই মন ভালো নয়
মন ভালো নয়

দেখা হলেই চোখের মধ্যে
শূন্য বাসায়
চোখপাখিটা ঝাপ্‌টে পাখা
আছ্‌ড়ে ভাসায়
আশায় আশায়

টুকরো ভাঙা ডিমগুলোতেই
তা দিতে চায়
ছিন্নভিন্ন শূন্য খাঁচায়
খাঁ খাঁ ফাঁকায়
অবোধ ডাকা
অবুঝ খোঁজায়
একলা যোঝা
মরুৎব্যোমের মতন শূন্য
চোখের বাসায়
অচিন্ ভাষায়
সর্ব নাশায়

না দেখাটাই ছিলো ভালো
ছিলো ভালো
ভালো ছিলো
দেখা হলেই ডানার ঝাপট্
মন ভালো নয়
দেখা হলেই চোখ জলে যায়
চোখ জলে যায়
দেখা হলেই চোখ গেল ! চোখ গেল !

একেক্কে এক
ডোবে ভাসে
বলেই আসে
কেউ শেখেনি থাকা

গাছের তলে
গাছের ডালে
ঠোক্‌রানো আর দেখা

হাতের কাছে
ত্রিলোক আছে
বুকের ভেতর ফাঁকা

পুন্নাম

সচ্ছিদ্র গেঞ্জির মতো অবিকল স্বচ্ছন্দে, হৃদয়
খুলে ফেলে দিয়ে গেলো ভালোবাসা, শপথ, মমতা-
পরে' নিলো শনিবারে চেতলার হাট থেকে কেনা
নতুন গামছার মতো রঙ্‌দার উচ্ছল প্রণয়।

ভালোবাসা, ছিলি রাতের ঊর্মিমালা
ফস্‌ফরাসের উজ্জ্বল উষ্ণীষ—
ভালোবাসা, হলি দহন দুঃখজ্বালা
সহমরণের তীব্র শঙ্খবিষ!

এসো, ভালোবাসা, লোহা ছোঁও, এ-আগুনে
শ্মশান-অশুচি শরীরকে করো শুদ্ধ
এসো, ভালোবাসা, হরিনাম শুনে শুনে
ধমনিতে আর বিষ নেই অবরুদ্ধ।

এসো, ভালোবাসা, স্বপ্ন দেখার ক্লান্তি
এইবারে শেষ। এসে গেছে বিশ্রাম—
অচিরেই পাবে সুষম শূন্যে শান্তি—
এসো, ভালোবাসা, এইখানে পুন্নাম॥

স্মৃতির ছড়া

স্মৃতি আমার চড়ুইপাখি, বেড়ালছানা—
স্মৃতি আমার পাড়া, আমার বাস্তুভিটে
স্মৃতি আমার কাজলাদীঘি, শিউলিতলা,

স্মৃতি আমার চড়কমেলা, দুগ্‌গাবাড়ি
স্মৃতি আমার উঠোন, দালান, ছাদের সিঁড়ি
স্মৃতি আমার মা-বাপ, আমার চোদ্দপুরুষ
স্মৃতি আমার চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসা
স্মৃতি আমার সূর্য চন্দ্র নবগ্রহ
স্মৃতি আমার ক্ষিত্যপ তেজমরুৎব্যোম্‌ ।

ইন্দ্রসভায়

না হয় ফাটলো দুম্‌দাম্‌ দুটো বোমা
খসে গেল এত জরুরি দখিনহস্ত
আছে তো বাঁ হাত, দুটি শ্রীচরণ আস্ত,
ইন্দ্রসভায় নেচে যা, তিলোত্তমা ।

আছে চোখ কান নাসিকা রসনা দন্ত
রয়েছে বিশ্বজগৎ অনাদ্যন্ত
নেড়ে চেড়ে ছাখ্‌, ঝুলিভরা সম্পত্তি
ইন্দ্রসভার হারিয়েছে একরত্তি !

রথযাত্রা — ১৩৭৯

এবারে রথের দড়ি পশ্চাতে ফেরাও সারথিরা
উল্টোরথের পালা শুরু ।
শেষ হোলো বৎসরান্তে একমাত্র প্রতীক্ষিত ক্রীড়া
স্বজন মিলন সব সারা
এবারে পিছনটানে রথচিহ্ন চিনে চিনে ফেরা ।

সমবেত পুণ্যার্থী সুজন
একটি ঘোষণা আছে ।   অনুগ্রহপূর্বক এখন
এ্যাবাউট টার্ণ করে নিন ।   অতঃপর
গর্ভগৃহে পুনর্বাসী হবেন ঈশ্বর ।

বালভাষিতম্ / শ্রাবণ ১৩৮৫

যখনি তোমাকে দেখি
আমার বুকের মধ্যে নির্বাসিত সেই
গৃহহারা, পথবাসী, তিন সন্ধ্যা অভুক্ত বালিকা
ভীষণ গোলমাল শুরু করে
জটা চুলে লক্ষ লক্ষ উকুন কামড়ায়
তেলহীন চামড়া ফেটে আকস্মিক রক্ত ঝ'রে পড়ে
তখন চীৎকারে তার কাকপক্ষী বসে না পাড়ায়
কেবল তোমাকে দেখলে
কেবল তোমাকে দেখলে
বুকের গহনে সেই বোধশূন্য উলঙ্গ শিশুটা
সব ধুলো খেলা ফেলে দিয়ে
'দাও, ভালোবাসা দাও'—বুভুক্ষু চীৎকার ক'রে
ডুকরে কেঁদে দু'হাত বাড়ায়—

সেই শুনে সঙ্গী সাথী পথবাসী কুকুর, কাকেরা
কাড়াকাড়ি খেলা বন্ধ ক'রে
আস্তাকুঁড়ে দু'মিনিট স্থির হ'য়ে থাকে ॥

স্বগত

সেতুগুলো ভেঙে যাচ্ছে ?
নাকি ভেঙে ফেলেছি নিজেই ?
চোখের মণিতে কিছু সংক্রামক অসুখ করেছে ?
সাক্ষাতে কাছের লোকও অকস্মাৎ
দূর হয়ে যায়। বড়ো অস্পষ্ট দেখায়।

আমি কি বিদেশে আছি ?
অথবা কি আমিই বিদেশ ?

তোমরা কি সেতু ভেঙে
নৌকো পুড়িয়ে দিয়ে আদিগন্ত দেশে ফিরে গেলে ?
নাকি দূর প্রবাসে বেরুলে ?

চোখের মণিতে কিছু অসুখ করেছে—
নাকি বুকেরই গহনে সেই রোগ ?
পৃথিবীর কী-যেন হয়েছে—
প্রতিদিন ঘুচে যায় অভ্যস্ত প্রভেদ
বাসা, ও প্রবাসে।
অবিরল, বাঁচা, না-বাঁচায় ॥

একেকটা খবর আসে ॥

একেকটা খবর আসে, শুনতে পাই—
কি রকম বিযুক্ত, সুদূর
যেন তেরোনদীর ওপার থেকে
ভেলায়-ভাসা বিনিসুতোর রূপকথা, অথচ
আসলে তো বুকেরই গভীর থেকে ওঠা
হৃৎপিণ্ডের টরে-টক্কা, এস্ ও এস্ !
খবর শুনে কেমন যেন করতে থাকে বুকের ভেতরে।
একটু তোলপাড়, একটু বুঝি ধু ধূ, একটু দাউ দাউ—
বুকের মধ্যে ঠিক এমনি ধারা হয় :

পেরুতে প্রবল ভূকম্পন—অগ্ন্যুৎপাতে
ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে কুড়ি লাখ মানুষ সুদ্ধু মহানগরী
কিম্বা সুইটজারল্যাণ্ডে গ্লেশিয়ার নেমে এসে
একরাত্তিরে ধবধবে করে মুছে দিয়েছে
তিনতিনটে ছবির মতো পাহাড়ী গ্রাম—
অথবা, এ-গর্তে সে-গর্তে একশোকুড়িজন বুদ্ধিজীবীর শরীর
পাওয়া গেছে বুড়িগঙ্গার ওপারে—

তোমার চিঠির খবরে
তেমনি মাইলের পর মাইল হু হু করা
ঝোড়ো বাতাস
বুকের খুপরির মধ্যে হঠাৎ আট্‌কা পড়ে
ভয়ঙ্কর গজরায়।
বুকের খাঁচার মধ্যে
হাহাকারকে পোষ মানাতে শিখে গেছি,
"বোস্" — বললেই ঠিক বসে পড়ে
শেকলে-বাঁধা চিতাবাঘ।

এছাড়া,
বুকের মধ্যে, খুব ভেতরদিকে, গোপন ট্রেঞ্চ খুঁড়েছি
আর সামনে তুলে ফেলেছি শক্ত ব্যাফ্‌ল ওয়াল
বোমার সময়ে যা-যা বিশেষ জরুরি —
তাদের আড়াল থেকে ঘাপটি মেরে লক্ষ্য করছি
নিজেরই ভিটে মাটি-চাটি হয়ে যাচ্ছে —
আর বলছি :
"আহাহা! কাদের ঘরে এতোবড়ো সব্বোনাশটা
হয়ে গেলো গো!"

অয়মারম্ভ

নতজানু বসেছি দুয়োরে —
ফিরে নাও ঋতুর সম্ভার
নদী ফুল পাখি
কোথাও রেখোনা কিছু বাকি
ফিরে নাও যতো দিশেহারা
সূর্য চন্দ্র তারা।

ফিরে দিয়ে জগৎ সংসার
ঋণমুক্ত ভোরে
গোল হয়ে ঘুরে যাবো
জন্মের প্রথম প্রহরে
তারপরে শুরু হবে দিন
মরীচিকাহীন।

যদুবংশ পালা ॥

দর্শকবৃন্দ, আসন গ্রহণ করুন, আলো এবার নিবছে।
সাজসজ্জা প্রস্তুত, মঞ্চসজ্জা শেষ, আসবাবপত্র
অপেক্ষমাণ, অভিনেতাদের প্রবেশ ঘটবে,
বাঁশি বেজেছে, পাদপ্রদীপ জ্বলেছে, ঘর
অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে।
মাননীয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা ধূমপান বন্ধ
করুন, পর্দা এইবার উঠছে :
যাদবের পাদপদ্মে লক্ষ্যস্থির করেছে
নিষাদ।

পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে

বড়ো বৈঠকখানাটা রাত্রে পেরুতে ভয় করতো—
ঝাড়লণ্ঠন যখন জ্বলতো না, ঘর-জোড়া অন্ধকার
ভেদ করে তাকিয়ে থাকতো সারিবন্দী ঝকঝকে চোখ
পিতামহদের।

নড়ে উঠতো কারো কাঁধের শালের ভাঁজ
লাঠির হাতলে দাঁত দেখাতো রুপোর বাঘ
যেন সবটুকু অক্সিজেন গিলে ফেলতো
উঁচু উঁচু তেলরং অন্ধকারে যুগান্তরের উদ্ধত তর্জনী।
বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা—
চুরি-করা তেঁতুল-ছড়া, লুকিয়ে-পড়া মোহন সিরিজ
নিমেষে বে-আব্রু হোতো—
চোখ বুজে একদৌড়ে পেরিয়ে যেতুম অন্দরের দিকে·
হে পিতৃপুরুষ সকল!
এতো বড়ো বৈঠকখানা পার হয়ে যাচ্ছি
এই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে কি তোমাদের শাদা চোখ
একবার ঝল্‌সে উঠবে না?

জলের অনেক নীচে

জলের অনেক নীচে খেলা করি, শর্তহীন, একা
সেইখানে পৌঁছবে না খাজনালোভী সমাজ পেয়াদা
জলের অনেক নীচে সৌজন্যের দুঃখ সুখ নেই।

জলের অনেক নীচে দিতে পারি নিঃসঙ্গ সাঁতার
আশ্চর্য বর্ণিল ফুলে নুয়ে পড়ে জলজ উদ্ভিদ্‌
সাবলীল লুকোচুরি মাছেদের খিড়কি বাগানে।

উপরে এসেছে ভেসে বাষ্পতনু দু'এক বুদ্‌বুদ
এই সব বুদ্‌বুদেরা স্বল্প আয়ু। ফেটে ফুটে গেলে
জলের উপরে কেউ কখনো জানে না কোনোদিন
শর্তহীন, সঙ্গহীন, অন্তরীণ ভালোবাসা-খেলা।

আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা

এবার আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা,
আমিই তোমার প্রেম, তোমার পৃথিবী।
ব্যূহ ভেঙে এই তো ফিরেছি, 'মৃতবৎসা, সসাগরা',
শূন্যকোল, অথচ দুধের ভারে অবনতস্তনী
এই ছাখো তলহীন লবণাম্বুরাশি দুই চোখে।

এসো তবে, চেয়ে ছাখো, কৌমার্য সন্ধ্যাসূর্য হয়ে
কপালে জ্বলছে দীপ্র
ছুঁয়ে ছাখো নবনীততনু—আজ তোমারি সম্পদ—
আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা,
তোমার বিরহদশা ঘুচলো এবারে
যেমনটি চেয়েছিলে, অবিকল তেমনি ফিরেছি।

তবে কেন রুদ্ধবাক্—স্তব্ধদৃষ্টি,—কেন বিহ্বলতা,
মুখ তোলো, চেয়ে ছাখো, সরিয়ো না চোখ
প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এই যে এসেছি
আমিই তোমার সেই চির-আকাঙ্ক্ষিতা
বাল্যসখী, পুরাতনী শিখা!

ঘরবসত

সমস্ত আসবাব বিকিয়ে দিয়েছি
এবারে ঘরখানা দেখে নিন
মেপে নিন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায়
ভালো করে পরখ্ ক'রে নিন মার্বেলের জাতকুল
ঘরের পরনে আর বেনারসী নেই, গদিমোড়া আসন পিয়োনো,
রবিবর্মা, জ্যাঠামশায়ের বাঘছাল,—কিছু নেই—
এখন পরনে শুদ্ধ দক্ষিণে বাতাস, পুবে রোদ।

দেখে নিন খোলা মেলা
ভেতর পর্যন্ত হাঁ করে দিচ্ছি
দেখে নিন পেটের গহ্বর, বুকের মেশিনরুম,
গোপন যন্ত্রপাতিসমূহ—
দেখুন একজোড়া চড়ুই কেমন ঘুলঘুলিতে
সিলিং ফ্যান খুলে নিচ্ছি
খুলে নিয়েছি ঝাড়লণ্ঠন, বিজলি পেঁয়াজ
এখন দেখুন ছাদখানাও কেমন পরিষ্কার,
ঠিক যেন মেঝে—

এইবার ঘরখানা চিনে নিন,
বাদ দেবেন না আনাচ কানাচ
ঝুলঝাড়া নিয়ে খুঁচিয়ে দেখুন কড়িকাঠ
ছেঁড়া খোঁড়া দড়িদড়ার ফাঁসটা এখনো
ঝুলছে টুলছে নাকি
বেশ করে চোখ বুলিয়ে নিন
খোলা মেলা উদোম ঘরটায়—
এবার বলুন
কলি ফেরালেই কি বসত চলে ?

একক পুরাণ

হু'হাত বাড়িয়ে বললুম :
—"কে আছো ? কোলে নাও।"
তুমি কোলে নিলে।

কিন্তু আমি ক্রমশ বামনের অনাদ্যন্ত ত্রিপাদ
আমি উত্তরোত্তর পবনপুত্রের অমোঘ অনড় পুচ্ছ
আমি / তোমার কোল ছাড়িয়ে···

বুক মাড়িয়ে···পাঁজর গুঁড়িয়ে···
দুর্বার ছড়িয়ে পড়লুম
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রেণু রেণু হয়ে মিলিয়ে গেলে
তুমি
আমার প্রথম ও একমাত্র
আশ্রয়।

এখন সব দরোজা, সব কোল
আমার পক্ষে
খুব ছোটো হয়ে গিয়েছে
এখন
কক্ষচ্যুত অনিকেত আমি
মহাশূন্যে অগ্নিক্ষর
মোকাবিলা করছি ঘূর্ণ্যমান গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে

একা···

এ ধরিত্রী সূর্যগর্ভা

জলে যায়। মাটির ভিতরে অগ্নি অখণ্ড জ্বলৎ।
খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে
যতো নিচে যাওয়া যাবে
প্রথমে ফল্গুর ধারা—
তারপরে অগ্নিকুণ্ড, অনির্বাণ, অনির্বাপনেয়।

মাটির ভিতরে জল
সে-জলের অন্তরে আগুন
বেশি দূর খুঁড়ে ফেলা হ'লে
ধরিত্রীও সূর্যগর্ভা।

জ্বলে যায়। মাটির ভিতরে মাটি জ্বলে যায়
জলের ভিতরে জল জ্বলে যায়
শূন্যের গভীরে শূন্য অখণ্ড জ্বলৎ।

দিগ্বিজয়ের রূপকথা

রক্তে আমি রাজপুত্র। হলেনই বা দুঃখিনী জননী,
দিগ্বিজয়ে যেতে হবে। দুয়োরানী দিলেন সাজিয়ে।
কবচকুণ্ডল নেই, ধনুক তূণীর, শিরস্ত্রাণ
কিছুই ছিল না। শুধু আশীর্বাদী দুটি সরঞ্জাম।

এক : এই জাদু-অশ্ব। মরুপথে সেই হয় উট,
আকাশে পুষ্পক আর সপ্তডিঙ্গা সাজে সিন্ধুজলে,
তেপান্তরে পক্ষীরাজ। তার নাম রেখেছি : 'বিশ্বাস।'
দুই : এই হৃদয়ের খাপে ভরা মন্ত্রপূতঃ অসি
শাণিত ইস্পাত খণ্ড। অভঙ্গুর। নাম : 'ভালোবাসা

নিশ্চিত পৌঁছুবো সেই তৃষ্ণাহর খর্জুরের দ্বীপে॥

হাইওয়ে ট্রাফিক

অবিরল ট্রাফিক লাইটে ঠোক্কর খেতে খেতে
গন্তব্য যে পদে পদে পালিয়ে যাচ্ছে, প্রভু!
আমি এইভাবে চলতে চলতে, থামতে থামতে,
দিশা হারিয়ে কোন্ পথে যে যাই—
যে দিকে তাকাই
লাল সবুজ হলুদ রঙের ধূর্ত নির্দেশ

মোড়ে মোড়ে ইশারা করছেন দয়াময় দেবতাগণ
বিভিন্ন মুদ্রায় ভারতনাট্যম চলছে
নটরাজ বরাভয়ে কোমল, অথবা নিষেধে সুকঠোর
এমন করে কি জীবন কাটে, প্রভু !
কেউ কি কখনও কোনওখানে পৌঁছুতে পেরেছে
এইভাবে ব্রেক কষ্‌তে কষ্‌তে—
হাইওয়ের আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে উঠেছি, প্রভু !
একটিবার সুপার হাইওয়েতে উঠে পডতে পারলে
এই সব শহুরে গলি, আর হাটুরে ভিড়,
এই গুঁতোগুঁতি, লাল নীল জটিল ইশারা
অবাধে ছাপিয়ে আমি এক গতিময়
শুদ্ধতায়, পরিচ্ছন্ন শূন্যতায়
পৌঁছুতে পারবো—একবার মুক্তি পেলে
জীবনের হাইওয়েতে আমি নির্বিঘ্নে
হুইল ধরে বসবো, আমি দেখে নেব তখন
আমার গন্তব্যটা আর দিগ্বিদিকে পালাবে কি করে

ঝড়ের গল্প

অগ্নিপিণ্ডের ঘূর্ণি তাণ্ডবে
নিয়েছো শুষে যতো দীঘির জল
করাতকাটা ক'রে কেটেছো মহীরুহ
নিমেষে ছায়া হারা বনস্থল

হাজার পদছাপে জ্বলছে পোড়াভিটে
উড়েছে ঘরদোর গৃহস্থর
কোথায় কতো দূরে ফেলেছো ধানগোলা
রান্না ঘরে হাসে তেপান্তর

হায়রে এভাবেই নোয়াবে পায়ে মাথা,
এই কি রাজবেশ, রাজেশ্বর ?
কেবল খাড়া রেখে একটি পাকা বাড়ি,
তোমারই মন্দির, অতঃপর !

আরণ্যক

মা, আমার বনবাস সমাপ্ত এখন
মা তুমি শ্মশ্রু গুম্ফ জটা ছেনে ফেলে
চিনে নাও কৈশোরের মুখ
চিনে নাও দুধের বালক
মা তুমি বুকের বাস খুলে দাও, দ্যাখো
সপ্তধারা স্তন্যসুধা মুখে ছুটে আসে-কি-না-আসে।

দ্যাখো, মা, যে-পায়ে বাজতো সোনার নূপুর—
কেমন বিক্ষত, ছিন্ন, কাঁটায় কাঁটায়
কী রুক্ষ, কীণাঙ্কিত সেই বাহু, যেখানে তোমার
কবচ পরিয়েছিলে, মন্ত্র পড়ে, জন্মের সময়ে।

মা, দ্যাখো আমার বুক, যেখানে তোমারি হাতে পোঁতা
হৃদয়ের চারা ছিলো খোলামেলা সবুজ দূর্বায়,
সেখানে প্রচ্ছন্ন গাঢ় অরণ্যের আবিল আঁধার;
এখন মাংসাশী ডালে, দন্তুর পাতায়, সর্বভুক্
জটিল জিহ্বায়, কেমন বাড়ন্ত হয়ে, বাঘের মতন
সেই বৃক্ষ অন্যান্যের হৃদয় চিবোয়।

মা, আমার বনবাস সমাপ্ত এখন,
এবারে বনের বাস
আমার ভিতরে।

দরিদ্র ভাণ্ডার

আশ্চর্য কিছুই নয়, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম
আশ্চর্য কেবল এই রক্তের নিনাদ
ভূকম্পনের মতো নড়ে-ওঠা সূর্যকলেবর
সূর্যের পায়ের নীচে অফুরান বিশাল জমিন্
চিরে যায় চিলের ডানায়
উঠে আসে আগুন, পাতাল,
আশ্চর্য কিছুই নয়, অহনি অহনি
পরম আশ্চর্যের দিকে অন্ধ ছুটে চলা
আশ্চর্য কিছুই নয়, রৌদ্রের কলহ আর জ্যোৎস্নার উত্তাপ
আশ্চর্য কিছুই নেই সময়ের দরিদ্রভাণ্ডারে—
ইন্দ্রিয় নশ্বর।
আশ্চর্য কেবল এক অদৃশ্য নির্ঝর।—
কোথা হতে উৎসারিত হয়
এই বিশ্বাস, বিষাদ,—
এই হৃদয় বিস্ময়,
এই প্রণয় প্রবাদ ?

ট্রাপিজ

লক্ষ্যস্থির করা আছে, অথচ এ তীরন্দাজি নয়
এ তো ট্রাপিজের খেলা
দূরে কাছে দূরের দোলন।
অথচ, এ সূত্রহীন নিরালম্ব টানা ও পোড়েনে
কিছুই হবে না বোনা।
শুধু মহাশূন্য কেটে অবিরাম সর্পিল ঝুলন।

এবং যেহেতু নিচে, বহু শূন্য পার হয়ে, নিচে
উর্ধ্বমুখ, রুদ্ধশ্বাস, সংখ্যাহীন দর্শকের ভিড়
এবং নাইলনজাল পাতা নেই সভার সৌষ্ঠবে,
সাবধান ! হাতের মুঠো হয়ে যাক লোহা
চরণে মরণ ঠেলে ফ্যালো ।

চোখেরই নৈপুণ্য নয়, এই লক্ষ্যভেদে
সর্বাঙ্গে দক্ষতা চাই । মৃত্যুপণ করে দড়িখেলা ।
আলগোছে ছুঁয়ে থাকা
ছন্দোবদ্ধ স্পন্দিত ত্রিকাল ।

সেভেন ফোর সেভেন জাম্বোজেট

এই যে উথালপাথাল সময় ফাটছে ঘড়ি
দিবসরাত্রি ঘুচে মুছে হলো সরলরেখা
তীরবেগে ছুটে পালায় পৃথিবী লাগাম ছিঁড়ে
থেকে থেকে নাচে রুপোলি ডানাতে সোনার শিখা
নীল ছুঁয়ে ও কে ? মরিশাস দ্বীপ ? একলা শুয়ে ?
কখনো ভাসছি কখনো ডুবছি শূন্যে একা
নেই কিছু নেই ডাইনে কি বাঁয়ে ওপরে-নিচে
যতোবার চাই দেখি এ শূন্য নাম না-জানা

কলকাতা, তুমি আছো কি এখনো গঙ্গাতীরে
গুটিসুটি শুয়ে হাওড়াব্রীজের কোলটি ঘেঁষে ?
ঢাকুরিয়া লেকে, সন্ধ্যাসূর্য, বরের সাজে
কিশোরী দেখতে এখনো কি রোজ বেড়াতে আসো ?
আরো কতো দূরে যাবে এই পথ আকাশ ফুঁড়ে
গড়িয়াহাটার পরের স্টপেই ইস্পাহান—

এ কী এল্ বাসে ননস্টপ ছুটি রুদ্ধশ্বাস
পথের দু'ধারে সারি সারি মেঘ, স্কাইস্ক্রেপার

কৈশোর ! সে তো পিছু-হটে যাওয়া শ্যামল রেখা
এখানে অপার অমেয় আকাশ কেউটে-ফণা
দশ দিশি ঘিরে সবল শূন্য প্রবল বেগে
ছোবল বসাতে ছুটে আসে বুকে, বক্ষমূলে—
গতি নেই, নাকি যতি নেই কোনো, ছিন্নবাধা
যৌবন, মহাযৌবন কাঁপে ভীষণ জেদে

আরো কতোকাল দূর থেকে শুধু অমিতদূরে
অবিরল তোকে ছেড়ে যেতে হবে রে কলকাতা !
উঠি-পড়ি-নাচি বিপুল বৃত্তে মরুৎ ব্যোমে
পায়ের তলায় নেই জমি নেই বিধুর ফাঁকা
বুঝি না সত্য নাকি এ মিথ্যে মরা কি বাঁচা
আরো কতো দেরি, আরো কতো দূরে টার্মিনাস ?

তিলাঞ্জলি

[স্বর্গীয় অতীন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে]

—'আমার মায়ের কাছে আমি ফিরে যাবো।'
হে পর্বত, হে অরণ্য, পুণ্যতোয়া নদী—
হে সপ্তর্ষি, অরুন্ধতি ! হে ধ্রুবতারকা !
তোমরা সাক্ষী থাকো আমার যাত্রায়
তোমরা সঙ্গী থাকো আমার যাত্রায়
-আমার মায়ের কাছে আমি ফিরে যাবো।

হে পিতা, হে জ্যোতির্ময় নক্ষত্রমণ্ডলী
আমার মায়ের কাছে আমি ফিরে যাবো
হে জননী, হে কল্যাণী, পৃথিবী আমার—
তোমার গর্ভের মধ্যে আমি ফিরে যাবো
জ্যোতির্ময় বীজ হয়ে, নক্ষত্রের ভ্রূণ হয়ে আজ
আমি ফিরে যাবো।

হে পর্বত, হে অরণ্য, পুণ্যতোয়া নদী—
অঞ্জলি গ্রহণ করো আজ,
আমার সর্বস্ব আমি তোমাদের সমর্পণ করি।
মধু বায়ু, মধু জল, মধুর ধূলিতে
অগ্রহায়ণ আমি তোমাদের উৎসর্গিত করি।
জন্মান্তের পুণ্যফল এই জন্মদিন
তৃপ্ত হও ত্রিভুবন, তৃপ্ত হও সকল পুরুষ

আমার নিজস্ব বলতে শুধু জন্ম শুধু জন্মদিন
আমার সর্বস্ব বলতে শুধু জন্ম শুধু জন্মদিন
পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে শুনেছি তো পূর্ণ বাকি থাকে
হে পর্বত, হে অরণ্য, পুণ্যতোয়া নদী
এখন আমাকে তোমরা যে কোনো যেনামে ডাকতে পারো
পবিত্র, বা অপবিত্র হই,
পুণ্ডরীকাক্ষের নামে জন্মদিন ফিরে দিয়ে আমি
ভিতরে-বাহিরে শুচি

নতুন জন্মের মধ্যে মা'র কোলে ঠিক ফিরে যাবো ॥

যদি-১

ছুতো করে ভালোবাসা যদি ফিরে নাও
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা দূর করে দেবো
কবিতা লতার মূল উপ্‌ড়ে ছিঁড়ে নিয়ে

চিরতরে ছাইগাদায় গুঁজে দেবো সুখ
ভালোবাসা যদি ফিরে নাও
তোমার এ পঞ্চভূত লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারি
ঋতুর পসরা তুলে
হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো চালাকি তোমার
মিথ্যে নামে জালিয়াতি কারবার চালানো
সে তো জগবন্ধু নয়, জগৎশত্রুতা যার কাজ !

এই বলছি, ভালোবাসা যদি ফিরে নাও
তোর ত্রিভুবন আমি ছোট্ট নুড়ি পাথরের মতো
যে-কোন খালের জলে খুব জোরে
ছুঁড়ে ফেলে দেবো
তোমাকে পাবে না খুঁজে তোমার ন্যাওটারা আর
জন্মের মতন।
ভালোবাসা ফিরে নিলে খুব অনায়াসে আমি
এইসব অনাসৃষ্টি পারি।

যদি-২

যদি ফিরে নাও ছলেবলে ভালোবাসাটি
একটানে খুলে ছিঁড়ে নেবো চাঁদ সূয্যি
পদাঘাতে গুঁড়ো করে দেবো সাত স্বর্গ
যদি ফিরে নাও ভালোবাসা, তবে ঘোচাবোই
ছয় ঋতু জুড়ে পাঁচটি ভূতের নৃত্য
শক্ত রবারে দুঃখ বুলিয়ে নির্ঘাৎ
ঘষে মুছে দেবো পেনসিলে আঁকা পৃথিবী
আকাশের গায়ে ঝুলবে কেবলই শূন্য—
এবং ঝুলবে দুঃখী শূন্যস্রষ্টা।

সে কি ভালো হবে ? এত কষ্টের সৃষ্টি ?
তার চেয়ে ধরো দু'হাতে—জড়াও দু'হাতে—

ঝোঁপে ঢেকে রাখো ভালোবাসা মায়ামমতায়
সেখানেই তুমি, সেখানেই চাঁদ সূয্যি
সেখানেই তুমি, ভালোবাসা সাতস্বর্গ—

সৃষ্টিকর্তা, সেখানে তোমারও মরণবাঁচন প্রশ্ন।

নিমফুল

হাতের মুঠো খুলে
খুচরো ভালোবাসার পুঁজি কে নিয়েছিস তুলে
অবাক সরোবরে
গন্ধবিহীন পদ্ম থরে থরে।
(কেউ দিবিনে বাধা—
আমার বাক্স-বেডিং বাঁধা
ছিন্ন কলরোলে
আমি যাবোই যাবো চ'লে)

আঁচলা-গেরো খুলে
কে নিয়েছিস স্বপ্ন স্মৃতি সব নিভৃতি তুলে
পত্রবিহীন বনে
উলঙ্গ ডালপালার নৃত্য শূন্য সমর্পণে।
(কেউ দিবিনে আড়ি
আমি যাবোই যাব বাড়ি)
আকাশ বাতাস তেতো
এই বসন্তে নিমফুলে ফুল নিমফুলে ফুল ভেতর।

গঙ্গাসাগর

বাঁ দিকে নিঃসীম দূর
ডান দিকে মনসার দ্বীপ
আমি কোন্‌দিকে যাবো ?

তুমি মোহনায় আছো
আমি মোহনার দিকে যাই।

কুন্তির গেরুয়া স্রোতে আম জাম কাঁঠালের ছায়া
পার হয়ে এইবারে ছায়াহীন গৈরিক সাগর
নিরবধি গহন পাথার
নিরবধি আগ্নেয় আকাশ
এবার এইখানে তুমি।

নির্মম মুনশির চর ডুবে যায় জোয়ারের জলে
মজ্জমান সমর্থ বৃক্ষেরা
ও-দ্বীপে মাটির নিচে রাজার ঐশ্বর্য বহে যায়
মাটিতে প্রহরী চরে। পালে পালে দাঁতাল শুয়োর
ও-দ্বীপ তোমার দ্বীপ নয়।

তুমি জলছিটে দিয়ে মধ্যাহ্নসূর্যের চোখ ধুয়ে দাও
বাতাসে চন্দন মেখে রাখো
আকাশ আনত হয়ে তোমার ব-দ্বীপ ছেয়ে রাখে
আমি ঘোমটার ফাঁকে কী সহজে উঠোনে তোমার
অন্তরীণ নিঃসীমতা ছুঁই।

বাঁ দিকে অকূল ব্যাপ্তি, নীলছায়া রুপোলি সাগর
বাঁ দিকে স্বচ্ছতা কাঁপছে মাছের মতন
দিগন্ত বলয়ে পাখি নেই—
ডান দিকে মনসার দ্বীপ, ধানগোলা, খালজেটি, বলো
আমি কোন্‌দিকে যাবো ?
তুমি মোহনায় থেকো,
আমি মোহনার দিকে যাই।

গ্রহান্তরী

কেউ বলে : 'তুই ঘুমিয়ে হাঁটিস—
ঘুমের ভেতর হাঁটা,
গায় লাগে না হল্কা আগুন
পায় ফোটে না কাঁটা'

কেউ বলে : 'তুই ভূত-পাওয়া লোক
ঝেঁটিয়ে ঝাড়াই বিষ
ঠিক বেরুবে সংসারী মুখ
জাগবি অহর্নিশ'

কেউ জানে না গোপন হিসেব
কে থাকে কার কোলে
কে যে কাকে আগলে রাখে
ঝঞ্ঝায় বাদলে

কেউ জানে না, সেই যে মানুষ,
অচিন্ গ্রহের লোক
দিন দুয়েকের অতিথ, না তার
সুখ আছে, না শোক।

দেখা

নাহয় দেখা না হলো তাতে কী আর আছে ক্ষতি
মনের মধ্যে নিশি দিবস দেখা
বুকের মধ্যে একটা নদী বইছে একা একা
লাজুক সরস্বতী
ঢেউয়ের পরে ভাঙছে ঢেউ ঘাটে
মনের মধ্যে চাঁদের তরু বাড়ে এবং কমে

জগৎ ঝেঁপে জ্যোৎস্নাফুল ঝরে
জ্যোৎস্নাফুলে বাতাস লেগে দুঃখফল ফাটে
অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে ওড়নাপরা বীজ
না হয় দেখা না হোলো তাতে কী আর ক্ষতি আছে
এমনি করে নিশি দিবস মরা এবং বাঁচা
ভস্ম থেকে উজিয়ে ফোটে ম্যাজিক মনসিজ
অবাক জলে বুকের ঝারি ভরে
বুকের মধ্যে একটা নদী বইছে নিরবধি
মনের মধ্যে অন্তহীন দেখা।

সময় : যৌবনকাল, ঠিকানা : পৃথিবী

কথা ছিল, দেখা হবে।
টুকরো টুকরো ব্রিজ ও মিনার
হাতে নিয়ে, প্রেমিক আমার—
অখণ্ড সময়ে আর অনন্ত জগতে
আমি পথ চেয়ে থাকবো,
সেম টাইম, সেম প্লেস—
সময় যৌবনকাল, ঠিকানা পৃথিবী।

এই তো যৌবন তৈরি, পৃথিবী প্রস্তুত।
ব্রিজের ভগ্নাংশ জুড়ে চমৎকার ব্রিজ হয়ে গেছে
একটানে সেতুবন্দী ইহনদী এপার-ওপার
মিনারখণ্ডেরা সব পরস্পর মিতালী করেছে
দীর্ঘ স্তম্ভ উঠে গেছে ত্রিভুবন-নক্ষত্রবিস্তার।

কথা ছিল, দেখা হবে।
আমি আছি, প্রেমিক আমার—

অখণ্ড সময় বুঝি বহু দীর্ঘ কাল।

স্মৃতির মতন বর্তমান

কী নেবে? কী দিতে পারি? বহুদিন পরে দেখা হলো—
চিনির মঠের মতো হাওড়ার ব্রীজ ভেঙে এনে
থালাতে সাজিয়ে দেবো? গঙ্গানদী ছেনে
স্রোতটুকু চেঁছে নেবো, দুধ থেকে সরের মতন?
সুন্দরবনের হাওয়া ভরে দেবো তালের পাখায়?
চাঁদের রেকাবি ভরে বেড়ে দেবো রমণী রতন?
কী নেবে? কী দিতে পারি? অফুরান প্রেমিক আমার—

চুলে বিলি কেটে যায় জ্যোৎস্না, তৃণ, স্মৃতির মতন হাহাকার
চেয়ে দেখি প্রিয় মুখ, বহুদিন পরে দেখা হলো,
কোজাগরী চন্দ্রাতপ মাঠ ভরে বাসর সাজায়
হাত পাতো, রাত্রি চলে যায়—
বলো, কিছু বলো—

যতোদিন দেখা নেই, ততোদিন চিতা পেতে শুই—
ততোদিন এই মাটি, এই আলো, বিদেশ বিভূঁই।

মানস গঙ্গোত্রী-১

চুলের মধ্যে চুইংগাম হয়ে আটকে আছে চোদ্দ বছর বয়েস করতলে কৈশোর ভুরু বেয়ে গলে পড়ছে চাঁদের মোম যোগফল: শূন্য স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নের যোগফল: শূন্য—যেমন বাতাসের সঙ্গে শিশিরের চোখের ভেতরে চোখ জুড়ে চোখ জোড়া ধুলায় বিছানো

শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ······

একে কি ভালো বলবো একে কি বাসনা বলবো মাথার ভেতরে এই অরণ্য প্রান্তর বুকের ভেতরে এই ষাট মাইল···নির্জন, নির্যান···মঞ্জরিত শালবীথি—চোয়ালের ভেতরে পর্বত গলার গভীরে বালিয়াড়ি মাথার মধ্যে জলপ্রপাত বুকের ভেতরে বুকজোড়া মাঠ চোখের ভেতরে চোখজোড়া চাঁদ নখাগ্রে

নক্ষত্ররাজি করতলে কৈশোর পাঁচ আঙুলে পঞ্চনদে মুষ্টিবদ্ধ কৈশোরের কান্না
গলে পড়ে মুক্তিহীন···

মানস গঙ্গোত্রী-২

যাকে ভেবেছিলে গতিহীন
সেই দেখা দিলো স্রোতোবতী কাকচক্ষু
জাগরণ প্রস্তুতিহীন।

আকাশে বাতাসে ক্ষতিহীন
ছিলো নিশায় দিবসে মিশানো শুক্লপক্ষ
জ্যোৎস্নায় সম্মতিলীন।

হ'লে হঠাৎ সময় যতিহীন
নিয়ে শিকড়ে-কুঁড়িতে জুড়ি-বাঁধা একলক্ষ্য
নিমেষে নিহত প্রতিদিন।

যদি নিহতই হোলো প্রতিদিন
তবে কী ক্ষতি এমন করতো যক্ষ-রক্ষ
যদি সূর্য উঠতো স্মৃতিহীন!

মাৎসর্য সঙ্গীত

কবি মশাই, কী যন্ত্রণা! সামনে যখন আপনি থাকেন
কী আর বলব, বলতে গেলেও যার পরে নাই লজ্জা করে
মার্কিনী সেই পাগ্‌লা কবির বুকের মধ্যে যেমন হতো
রবি-মশাই থাকলে ঘরে। ঠিক অবিকল তেমনি আমার
বুকের মধ্যে ঝাপুর ঝুপুর কেলেঙ্কারি। ঠিক মনে হয়
কাঁধের ওপর হাড়-পাথরের মস্ত মুগুর, বিষম ভারি,

এবং গা-ময় কী দীর্ঘ লোম, কোমর থেকে
পশুর চামড়া ডুমুর পাতার বদ্‌লি ঝোলে,
দশ আঙুলের দশখানা নোখ ভর্তি কেবল
রক্ত, মাটি, নোংরা, ধুলো—আজানু পাঁক।
যতক্ষণ না পালিয়ে বাঁচি স্বস্তি উধাও বিষম জ্বালা।

আপনি হঠাৎ সামনে পড়লে ঠিক মনে হয় এই আজীবন
গুহায় ছিলুম। হামাগুড়ি, দুইহাতে হাড় চুষছি এবং
কষ্ বেয়ে লাল রক্ত, লালা—সেই ভাবেতেই পৌঁছে গেলুম
—কোথায়? না ঠিক তাজমহলের মাঝমহলে!
কিম্বা ধরুন দিলওয়ারার মন্দিরটার গর্ভগৃহে!
কবিমশাই, আপনি যেন মর্মরফুল, সহস্রদল, মার্বেলে ঠিক
আপনি-ফোটা শ্বেতকমলের মতন নরম, কী সাবলীল,
পাথর কুঁদে মর্মরে ফুল ফুটিয়ে তোলা নৈসর্গিক
ক্লেশহীনতায়, সহজ তো নয়। সহজ তো নন
আপনি, মশাই! শক্ত অমন সহজ হওয়া।

আপনি যখন সামনে আসেন ঠিক মনে হয়
এই পৃথিবী পৃথিবী নয় বনজঙ্গল, অন্যগ্রহ—
এই আমি আর এই আমি নই, বনমানুষী,
উদোম, লোমশ, উকুনভরা, হিংস্র, এবং
দাঁত মাজিনা।
আপনি থাকেন রেশমী হাসির সূক্ষ্ম জালের অন্তরালে
দূর বিদেশী, গ্রহান্তরে যোজন যোজন দূর থেকে তাই
তাকিয়ে থাকা নির্নিমেষে, নয়ন ভরে, জংলী চাষার
যেমন সন্ধ্যাতারার দিকে ধন্য হাসি।

এমনি আপনি সভ্যভব্য, হায় রে পাঠক! কী ভবিতব্য!
বাক্য বলবে সাধ্য কী তার, শূন্যকলস-বাদ্য-বিচার?
তুচ্ছ পাঠক আত্মহারা, উদ্যত সম্ভ্রমেই সারা! দীনাতিদীন!

মাপ করবেন, কবিমশাই ! অভয় দেন তো বকুনি দেই ?
—কাজ কী এমন সুসভ্যতায় ? অমানুষিক অভদ্রতায় ?
যার তেজে নিষ্প্রদীপ কালো স্বার্থবিহীন নেহাৎ ভালোও,
খাস নিরামিষ ভালোবাসাও ? কবিমশাই,
এবার একটু অসভ্য হোন। এবার একটু অসহ্য হোন।
একটু একটু মনুষ্য হোন ? আর কতদিন ঘিয়ের প্রদীপ
উদ্ভাসিত ননীর মতন পাথর পুষ্প ? পরাগবিহীন ?
অপাপবিদ্ধ পরমশুদ্ধ বীজাণুহীন ? আর কতকাল
শুভ্র রুমাল নাকমুখে ব্যান্‌ডেজের আড়াল ? জৈন মুনিন্‌ ?

তার চেয়ে হোন তাম্রবরণ, এবার বরং
বাঘের ছালটা আপনি পরুন, এই মুগুরটি
আপনি ধরুন। কবিমশাই, এবার একটু,
গুহায়-টুয়ায় ঢুকলে হয় না ? একটু একটু
অসভ্যতায় খুব কি ক্ষতি ? সংস্কৃতির ?
একটু না হয় নষ্ট সময় শব্দবিহীন অসৌজন্য
অরণ্যানীর অন্ধকারেই কাটতো অপার,
কাটতো বন্য—কবিমশাই, তাকিয়ে দেখুন,
নেহাৎ তুচ্ছ তৃণের গুচ্ছ, অধীন পাঠক—
ইহার জন্য ?

কাচঘর

১

মধ্যগাঙে জলবন্দী কোনো এক স্থবির স্টিমার
মাস্তুলে সন্ধ্যার মেঘ বেঁধে নেয় ভীষণ সাহসে
ভয়ংকর লংকাকাণ্ড শুরু করে দেয় অতর্কিতে
জলে স্থলে আকাশে বাতাসে
হু হু হাওয়া আমূল আগুন

অতীত উৎখাত হয়ে যায়
সন্ধ্যালগ্নে কাচঘর জ্বলে ওঠে
অশ্রু বুঝি ঘৃতের আহুতি

আকাশ আকাশ ছাই
সারারাত্রি ধরে ঝরে পড়ে
কাচ ঘরে
কাচের শহরে

২

কাচের এপাশে এসো, মাটির উঠোনে
শজারুর মতো অন্ধকার
ঝিমন্ত গৃহস্থালি নিভন্ত উনুন
চলন্ত নৌকোর ছায়া বুকে নিয়ে
ডুবন্ত জাহাজ ঘুমন্ত গঙ্গার সঙ্গে
আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে থাকে

ঊর্ধ্বাকাশে মহারঙ্গ
অনন্ত দিগন্ত জুড়ে যুগান্ত-গোধূলি
ছেয়ে ফেলে
কাচের ওপাশ

৩

এইবারে একা হয়ে যাও।
কাচের এধারে এসো,
কাচের এধারে কেউ নেই।
শজারুটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
ঘাসের উপরে
ঘুমন্ত ? জীবন্ত ? ঠিক জানা নেই—

‘এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে’

সারি সারি বিজলী আলোয়

ট্রামের লাইন-পাতা স্বপ্নের শহরে।

৪

মধ্যরাত, মধ্যগঙ্গা, হে মধ্যযৌবন
কাচের ওপাশে চলো।
কাচের ওপাশে স্থির সবুজ সিগন্যাল
দীর্ঘ হুইসিল মেরে ছুটে যায় দীর্ঘ বর্তমান
বুকের পুকুরে তার চলমান দীর্ঘ ছায়া পড়ে

একটি বালিকা তার পাশে পাশে নিত্য ছুটে চলে
কাচের ওপাশে হাসে সবুজ সিগন্যাল
বুকের তলায় তার নিদ্রাহীন লাল
স্তব্ধ অপেক্ষায়

বালিকা জানে না
কিন্তু মধ্যরাত্রি জানে

৫

কাচের ভিতরে কার ঘর দেখা যায় ?
ঘরের ভিতরে কাচঘর—

কাচঘরে বসে আছে
বৈদ্যুতিক যুবক যুবতী
টেবিলের এপার-ওপার
মসৃণ মর্মরখণ্ডে
হাঁসপাখা প্রেম পিছলে যায়

আঙুলে আঙুল ঠুকে
ফস্ করে জেলে দেয়

যৌবনের চকমকি পাথর
এইবারে ছোটোখাটো অগ্নিকাণ্ড
শুরু হবে ঘরের ভিতর

ঘরের ভিতরে কাচঘর
কাচের ভিতরে কার ঘর দেখা যায় ?

৬

কাচের ওপাশে যাস নি,
বাছা তুই ভয় পাবি, কাচ
ভীষণ রক্তাক্ত করে
স্মৃতির শরীর
কাচের ওপাশে ঘন
শজারুর মতো অন্ধকার

তার চেয়ে মরীচিকা ধরো—
কাচের এপাশে এসো
এই কাচঘরে
উদ্দাম বাদ্যের সঙ্গে নৃত্য করে
তরল তৎক্ষণ
এখানে অদ্ভুত আলো
নেভে জ্বলে দু'চোখ ধাঁধায়

শজারুটি মুখ থুবড়ে
পড়ে থাক্ টেবিলের নিচে
মখমল, সবুজ কার্পেট
ভিজে যাক্ পশুর শোণিতে—
সেই ভালো, বাছা তুই
সরে আয়, কাচের এপাশে ॥

৭

কাচের ওপাশে যেও না,
হে মধ্যযৌবন
দপ্ করে জ্বলে উঠবে শূন্যসার আলো
নহবতখানা থেকে নকল শানাই শোনা যাবে
মুহূর্তে উত্থিত হবে ডুবে-যাওয়া সপ্তডিঙা তরী
ঝল্সাবে হাজার-দুয়ারী রাজবাড়ি

কাচের ওপাশে যেও না
হে মধ্যযৌবন
মায়াপুরী ছিঁড়ে নেবে বুকের শিকড়
জনশূন্য রাজপথ, গৃহহীন অলীক নগরী
নিঃসীম মরণ আর নিঃসাম স্মরণ

৮

কাচঘরে বহুদিন কাচের পুতুল হয়ে আছি
এবারে বদল হলে ভালো

এসো, জানোয়ার হই—
এসো, জানোয়ার হবো এসো
এই দ্যাখো কী সুন্দর পোশাক এনেছি,
লোমশ, কবোষ্ণ কোট, পরে নাও গায়ে
এই নাও নখর, শ্ব-দাঁত—

এসো, এইবারে এসো, শুরু হোক নিশায় চারণ
এই গৃহ গুহা হয়ে যাক
এবারে ভীষণ রঙ্গ শুরু হবে বুকে

শুধু এক পলকের
সরে যাওয়া চাই
কাচের এপাশ থেকে কাচের ওপাশে

অনন্ত মধ্যরাত্রি, এ মধ্যযৌবন
নিশায় নেশায় বেশ চরায়-বরায়
কেটে যাবে কাচের পিছনে

কিম্বা এসো, কাচ ভেঙে ফেলি ;
কাচঘর কে চায় জীবনে ?

বিহঙ্গ

যতই ঘোরো, পথে পথে যতই পোড়ো
হওনা ঝোড়ো-কাকের মত যেমন খুশি
তেমন তরো, ঘরের দিকে যখন ফেরো
তখন জানো জলছে বাতি, পুনঃপাতী।
পথ পেরুলেই, সঙ্গী সাথী।

কিন্তু আমি ঘরেই থাকি গুপ্ত রাখি
প্রাণের পাখি। সকল অঙ্গ হয় ত্রিভঙ্গ
মণির বন্ধে জরির রাখী পাকে পাকেই
জড়িয়ে রাখি। কে না জানে জরির দড়ির
সোনার অঙ্গ সোনার শরীর
গেরোয় গেরোয় হই নিসঙ্গ
সোনার রঙ্গ, সোনার ফাঁকি
কাঁদে বিহঙ্গ, খাঁচার পাখি।

হ্রদ

অনেক দিয়েছিস জীবনভর
পথের মোড়ে মোড়ে বাড়ানো হাত
মুকুটপরা এই দরিদ্রের
বাড়ছে দিনে দিনে ঋণের ভার

একদা ঘরে ছিল উৎসবের
রঙিন ফিতে বাঁধা আলতো সুখ
তার বদলে দিলি গ্রহান্তের
বাদামী ধুলোমাখা তেরছা চাঁদ

উঠোন ভরে ওঠে প্রসাদে তোর
যতোই ঝুঁটি নেড়ে দে সাইক্লোন
বাড়ছে তোরি কাছে ঋণের ভার
বুকের মাঝখানে দরদালান

অনেক দেখা হলো, এবারে চোখ
ভীষণ শলা বিঁধে করে দে শেষ
আসে না অধিকারে অধরা ফুল
বৃথাই এত দিস দৃশ্যসুখ

এবারে কান দুটো বধির কর
শুনিয়ে দিয়েছিস গ্রহের গান
পাঁজর ফুলে ওঠে, প্রসাদে তোর
ধসে না কিছুতেই দরদালান !

এবারে দুটি মুঠি যুক্ত হোক
অহর্নিশি ধরা ধনুর্বাণ
এবারে ঋজু জানু ভগ্ন হোক
সান্ধ্য হ্রদে নেমে হোক প্রণাম।

শাশ্বত সময়

আধঘণ্টার জন্যে
পৃথিবীতে আর সব অক্ষর ফুরাক
'ভালো-বাসা' এই চতুষ্পদে
বর্ণমালা শেষ হয়ে যাক
আধঘণ্টার জন্যে
জগতের আর সব চক্ষুকর্ণ জিহ্বা লোপ পাক
কেবল থাকুক
দুটি জীব, দুটো জিভ্ জগৎ জুড়ুক
মর্মরিত উত্থানপতন
সিস্‌মোগ্রাফে ধরা থাক
জন্মের মতন

আধঘণ্টার জন্যে
হে পৃথিবী, থমকে দাঁড়ান
সৌরপিতা, মাধ্যাকর্ষ স্থগিত রাখুন
পাপপুণ্য ঘুচে যাক, মুছে যাক দিবসরজনী
এই মাটি হোক স্পর্শমণি
এই দেহ হোক নিষ্কলুষ
হে কালপুরুষ
আধঘণ্টার জন্য আপনিও আপনার
চক্ষুতারা সহস্র ঢাকুন

সাক্ষী থাকুন
শুধু শূন্য, ক্ষিতি, বায়ু, জল
অচঞ্চল, আর
অগ্নির মতন অন্ধকার ॥

এসো, খোকাবাবু

এই নাও, আমার মস্ত নীল বেলুনটা
এই হলদে তারা আঁকা নীল বেলুনটা
আমি তোমাকেই দিলুম।
তুমি তাতে আলপিন ফুটিয়ে দিয়ে
ঝোড়ো হাসি হেসে ওঠো।
আমি দেখি।

এই নাও, বাদামী বাতাসার ঠোঙা
আমার এই মাটিজলের শরীর
আমি হরির লুট দিলুম।
কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরে দাও,
কিম্বা টালমাটাল দুপায়ে গুঁড়োও—
আমি দেখি।

এসো, খোকাবাবু,
এই নাও, আমার সবুজ রঙের মার্বেলটা
আমার শস্যশ্যামলা মার্বেলটা
আমি তোমাকে দিলুম।
তুমি খেলতে খেলতে ছুঁড়ে দাও—
যে কোনো গর্তে
ওটা হারিয়ে যাক।
আমি দেখি।

এসো, খোকাবাবু।

পাণিগ্রহণ

কাছে থাকো। ভয় করছে। মনে হচ্ছে
এ মুহূর্ত বুঝি সত্য নয়। ছুঁয়ে থাকো।
শ্মশানে যেমন থাকে দেহ ছুঁয়ে একান্ত
স্বজন। এই হাত, এই নাও, হাত।
এই হাত ছুঁয়ে থাকো, যতক্ষণ
কাছাকাছি আছো, অস্পৃষ্ট রেখো না।
ভয় করে। মনে হয় এ মুহূর্ত বুঝি সত্য নয়।
যেমন অসত্য ছিলো, দীর্ঘ গতকাল।
যেমন অসত্য হবে অনন্ত আগামী।

প্রেম-১

[কবি অরুণকুমার সরকারের সৌজন্যে]

রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিস
আমার দুই চোখে শীতের বন
ভীষণ অসময়ে বাতাসে বৈশাখী
ভীষণ অসময়ে শুভক্ষণ !

পুড়ছে পুড়ে যায় পাহাড় বনতল
ভয়াল বেগে ছোটে ধূম্রগুচ্ছ
তোমাকে চাই শুধু তোমাকে বুকে চাই
মুঠোয় ধরেছিস স্নায়ুর গুচ্ছ।

এখন দিবানিশি ঘূর্ণি দশদিশি
এখন দিনমানে পূর্ণ চাঁদ
এখন সূর্যের গ্রহণ ক্ষণে ক্ষণে
অসম্ভব আর কোন্ প্রসাদ ?

কখন ঘুচে গেছে কক্ষপথরেখা
কখন ছুটে গেছে গ্রহের তান
এখানে যতি নেই লাভ বা ক্ষতি নেই
পায়ের নীচে ব্যোম চূর্ণ্যমান···।

প্রেম-২

কুসুম, ধান্যের রয়েছে কাল
কুকুর-বেড়ালেরও ভাদ্রমাস
আমাকে করেছিস হাড়ির হাল
হন্যে হয়ে মরি বারোটা মাস !

তেষ্টা ছাতিফাটা, ক্ষান্তি নেই
আমূল জলে যায় স্বস্তি, সুখ
তোমাকে ছাড়া নেই শান্তি নেই
অতল জলধারা তোমার মুখ !

তাকাও, চোখে হোক চোখের স্নান —
পেতেছি দ্বারে ক্ষুৎ-তৃষ্ণ ঠোঁট
ক্ষুধার্ত্তকে দিবি অন্নপান
বাড়িয়ে আন্ তোর জিষ্ণু ঠোঁট !

শেষ নাগ

বহুশীর্ষ শেষ নাগ হয়ে
শেষ প্রেম সমুত্থিত হয়েছিলো।
একা ? নাকি অনেকে দেখেছি ?

তুষারের স্তম্ভে ঘেরা চিরবন্দী
বিষনীল, তলহীন, শৃঙ্খলিত হ্রদে
চোদ্দটি বিদীর্ণ জিব বাতাসে খেলিয়ে
বহুশীর্ষ শেষ প্রেম ফণার ঝাপটে
তুষারে ফুলঝুরি তুলে
ভেসে এসেছিলো
শব্দহীন মোহন বাঁশিতে

কর্পূরের গন্ধে ভারি, হিমেল আলোয়
গা-ছম্‌ছম্‌ গুহার গহনে
অন্তহীন স্মরণে, ক্ষরণে
উদ্ভাসিত হয়েছিলো বুঝি
অতি স্পষ্ট, অতি সাময়িক, অতি-হিম, হিমলিঙ্গ—
একা ? নাকি অনেকে দেখেছি ?

কোনো স্বপ্ন-শ্রাবণের মুগ্ধ পূর্ণিমায়
প্রচণ্ড যাত্রার অন্তে
পরিশ্রান্ত নয়ন-বিভ্রমে
ভ্রূ-মধ্যস্থ জ্যোতি হয়ে, তাৎক্ষণিকে
ত্রিকাল ডুবিয়ে
হিমহ্রদে শেষনাগ ভেসে উঠেছিলো ?

মনিব সমীপেষু, বিনয়ী নিবেদন

[কবি অরুণকুমার সরকারের স্মৃতিতে]

বহুৎ দিন হলো পুরোনো পোশাকেই
রয়েছি হে মনিব, এদিকে চোখ দাও
এবারে করো প্রভু দৈন্য বিমোচন
জীর্ণ বাস ছেড়ে নতুন জামা চাই

কেবলি ছুঁচ-সুতো, অসার রিপু তালি
অপার ঢাকাঢুকি, ডাইনে বাঁয়ে টান্
নজরে পড়েনা তো একটি বারো প্রভু
ঢাকেনা বুকপিঠ। লজ্জানিবারণ।

তোমারি দায়, এই সহজ শর্তেই
এসেছি কর্মের অমোঘ বর্তনে
তুমিতো সরকার উদাসী আনমন
এ ছেঁড়া ন্যাকড়ায় চলে কি রাজকাজ?

অনেক দিন হলো গ্রীষ্মে বর্ষায়
রয়েছি পদতলে বিনীত শতদল
পায়ের ছোঁয়া দিয়ে ফুটিয়ে চলে যাও
পাপড়ি খসে পড়ে, সেদিকে চোখ নেই?

হেঁকেছে ফেরিওলা সেদিন রাস্তায় —
—"পুরোনো বসনের বদলে দিতে চাই
হিরণ্ময় এক পাত্রে ঢাকা সুখ" —
শুনেছি সেই হাঁক। দোহাই হে মনিব

মেটাও সাধ, হোক লজ্জানিরসন
এবারে কিনে দাও নবীন বেশবাস
খুলি এ ছেঁড়াজামা, অঙ্গে তুলে নিই
আকাশ গ্রহতারা বাতাস মাটি জল

স্লীপ ওয়াকার

[রণজয় কার্লেকরের স্মৃতিতে]

ঘুমের ভিতরে তুমি হেঁটে হেঁটে কতো দূরে গেছ।

বুকের গুহাতে বুঝি ঘনঘোর ঢাকের ইঙ্গিতে
জরুরি তলব এসেছিলো,
: ডিউটি শেষ, ফিরে যেতে হবে ?
ঘুমের ভিতরে তাই হেঁটে হেঁটে কতো দূরে গেছ।

ঘুমের গভীরে আরো নীল ঘুমে
নীলতর স্বপ্নের বাগানে
নক্ষত্রের ভিতর বাড়িতে, লীলাময়
আগ্নেয় পুষ্পের মধ্যে
ফণা তোলা বেগুনী হলুদে ঘোর লালে
কুণ্ডলিত তাম্র-শ্যামে
ধাতব ফুলঝুরি হয়ে
পৌঁছে গেছ সুস্থির স্বদেশে
চির নিরাপদ।

ঘুমের ভিতরে কোন্ দীর্ঘতম পথে হেঁটে গেলে
দিকচিহ্নহারা, পদশব্দহীন
রাত্রি নয়, প্রভাতও ছিল না
এ গ্রহের কাজ বুঝি সারা ?

বিদায় নেওয়ার মতো একতিল সময় পেলেনা,
এত তাড়া ছিলো ? স্বদেশে ফেরার ?

ব্যূহ

[শুদ্ধশীল বসু স্মরণে]

ব্যূহচ্ছেদ করতে শেখোনি।
তোরও বুঝি আজন্মের কবচকুণ্ডল
খোওয়া গিয়েছিলো কোনো মধ্যরাত্রে
জন্মযন্ত্রণার নীল রক্তকর্দমে ডুবে গিয়ে ?

কেবল বুকের পাটা, যৌবনের মতিভ্রম,
মৃত্যুর পরাক্রম ছিলো।
ছিলো না রক্তের জোর ধমনিতে বাকি
অতিরিক্ত মধুস্রোতে, মধুরাতে, মধুর সিন্ধুতে
ভেসে গিয়েছিলো সব,
থাকা, আর না-থাকার দ্বীপপুঞ্জ তোর।

ব্যূহচ্ছেদ করতে না-শিখে
ব্যূহমধ্যে ঢুকেছিলি, জেনেশুনে
নিশ্চিত মৃত্যুর গর্ভে রথ নিয়ে
ঢুকে গিয়েছিলি, কোন্ যুদ্ধে ?
কার যুদ্ধে ? অসম্ভব জয়ের প্রত্যাশী ?

জয় নয়, পরাজয় নয়
বরং হয়েছে মুক্তি
কী দরকার রণে ?

তুই থাক পিতৃপুরুষের কোলে,
নির্ভার, নিদায়—
তুই থাক অনন্ত যৌবনে।

নিশি-ডাক

সেইসব স্বপ্নের মাঠে ঘাটে
ইদানীং কারা পথ হাঁটে ?

আমি স্বপ্নমত্ত একজন—
চক্ষুহীন, দেখে নিতে চাই
পদহীন ছুটে যেতে চাই
জিহ্বাহীন, বিলাপ জানাই।

রহস্য প্রেমিকা এ মেদিনী
করতালি বাজিয়ে হেসে ওঠে
ঝনঝন কঙ্কন কিঙ্কিনী
"সময় হয়েছে" বলে দাঁড়ায় চৌকাঠে।
স্পর্শহীন, বক্ষের কবাটে
অনিবার্য নিশি-স্পর্শ পাই—

অনড় স্থাবর বৃক্ষ
ঝঞ্ঝার শীৎকারে সাড়া দিয়ে
একদিন বলে ওঠে—"যাই"।

১৯৮২

বল্মীক

মধ্যদিনে দাঁড়িয়েছো, রত্নাকর
চিনে নাও সংসার, স্বজন
বুঝে নাও হিসেবনিকেশ
পুকুরে তাকিয়ে দ্যাখো
স্পর্শমাত্র সরে যায় জল,
সব জল সরে যায়, দৃশ্যমান মকরে কুমিরে
জীবন দর্শন করো

পুণ্যের হাওয়ায় খোলে সব গ্রন্থি
হাওয়া দিলে গ্রন্থি খুলে যায়
দায়বদ্ধ/দাবীশূন্য/একই মুদ্রা/এপিঠ/ওপিঠ
থাকা/না-ই থাকা

স্মৃতি বড়ো অস্থির আলেয়া
দপ্ করে জলে উঠে মুছে যাবে
চরাচর বিস্তীর্ণ আঁধারে
তোমাকে নিজের মধ্যে একা করে দেবে নিরন্তর
নি-দুধ ধানের মতো সোনালি নিঃস্বতা

বুঝি মনোযোগ চাও ? কার মন ?
কার সঙ্গে যোগ ? রত্নাকর,
কী তোমার অর্জিত সঞ্চয় ?
চিনে নাও সাদা আর কালো
অংশভাক্ কেউ নেই
এই সারাৎসার ।

এবারে নির্ভার পায়ে, ঋষিপুত্র,
মূলে ফিরে এসো, ধ্যানে বোসো,
ওই ছাখো মরা ডাল—
ঐকান্তিক পুনরুচ্চারণে
ও-ই হবে অভিরাম ।

গূঢ় মনোযোগে,
দৃশ্য থেকে স্পষ্ট মুছে দেবে
প্রচণ্ড সাষ্টাঙ্গ প্রেমে, একদিন
তোমাকে, বল্মীক । তুমি তার ক্রিয়াকর্ম
জানতেও পাবে না ।

তুমি শুধু শ্রুত হবে, অন্তঃশীল প্রাণধ্বনিনাদে
দেবতার উৎসুক শ্রবণে ঠাঁই পাবে।

রত্নাকর, কিসের সংসার ?

পৃথিবী বাড়ুক রোজ

বিশ্ব ছোটো হয়ে যাক হস্তধৃত আমলকের মতো,
এ আমার প্রার্থনীয় নয়। আমি চাই পৃথিবী ছড়াক
আমার পৃথিবী আমি পরিশ্রম করে খুঁজে নেবো।
পৃথিবী, বিস্তীর্ণা হও, ব্যাপ্ত হও ব্রহ্মচরাচর,
আকীর্ণ ছড়িয়ে পড়, আরও, আরও নিঃসীম সময়
আমার পৃথিবী হোক অফুরান, অনন্ত বিস্তার
পৃথিবী, বর্ধিষ্ণু হও, আমি ছোট, আরো ছোট হই।

আমি ছোট হতে হতে একগুচ্ছ রেশমের মতো
নরম ও নিরাকার, যৎসামান্য ইশারা পেলেই
নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে রাজপুতানী মখমলের শাড়ি—
আংটির ফোকর দিয়ে সবিনয়ে গলে চলে যাবো।

পৃথিবী অনেক বড়ো, পৃথিবীকে ছোট হতে নেই।

পশুপাখি উদ্ভিদেরা কিছুমাত্র বিস্মিত হবে না
ওরা সব জেনে গেছে, মানুষের বেশি দেরি নেই।

আসাম,

তৈজসপত্তর ভাঙছে যা দিয়ে সাজানো ছিল
দুঃখীর সংসার।
তৈজসপত্তর ভাঙছে, মস্ত বড় দালানকোঠার

কড়িবরগা ভাঙবার মতন
প্রচণ্ড আওয়াজ করে' পড়োশীর দেওয়াল কাঁপিয়ে
ভেঙে যাচ্ছে
কাচের গেলাস

কাচের গেলাস ভাঙছে এতে আর আশ্চর্য কী আছে
আশ্চর্য কেবল এই রক্তের নিনাদ
এই মত্ত আলোড়ন
ভূকম্পনের মতো নড়ে-ওঠা পায়ের জমিন্
এই রুদ্ধশ্বাস···

দুঃখীর সংসার ভাঙছে এতে আর দুঃখের কী আছে
দুঃখীর সংসারে দুঃখ নামহীন—
হদ্দ মিশে যায়,
বাতাসে বাতাস আর জলস্রোতে জল

এতদসত্ত্বেও, কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ !
দোর্দণ্ড আওয়াজ করে' ভেঙে যায় দুঃখীর সংসার।
বাতাসে বাতাসে কাটছে
জলে ভাসে জল···

গোপন গর্জন শুনছো ? মাটির গভীরে শব্দ ওঠে—
দুঃখ বাস্তুসাপ
এইবারে ধ্বংসবিষ ঢেলে দেবে বত্রিশনাড়ীতে
মাতাল মায়ের গর্ভে
উঠে আসছে
পাতাল-আগুন—
তৃণে তৃণে কৃতান্তমুখল ·

তুমি শুধু মোহনিদ্রা ভাঙো

বিশল্যকরণী নেই,
ধমনীতে রক্ত আছে, দেবো—
তুমি শুধু মোহনিদ্রা ভাঙো !

যদি অন্ধ হয়ে যাই
যদি আর এই চোখ তোমাকে না দ্যাখে
সমস্ত পৃথিবী যদি তালাচাবি বন্ধ হয়ে যায়
আমার তা হোক—
তুমি শুধু তীব্র চক্ষু তোলো।

যদি বধিরতা আসে, আসুক আমাতে—
তোমার স্বরের ওই তরল আগুনে
যদি না সেঁকতে পারি বুকের পাঁজর
আমার তা হোক—
তুমি শুধু তীক্ষ্ণ কান মেলো।

আমি চুপ করে থাকি যদি চিরদিন
যদি মূক হয়ে যাই
বাকী সব কথাগুলি আজীবন রয়ে যায়
বুকের বালিতে বন্দী, অন্তঃসলিলা
আমার তা হোক—
তুমি শুধু দীপ্র মুখ খোলো।

তুমি নেত্রপাত করলে
এ পৃথিবী পুনর্যৌবনা···
তুমি যদি কান পাতো
মন খোলে আকাশবাতাস···
তুমি উচ্চারণ করলে
শ্রবণে উৎকর্ণ হয় নদী ও পাহাড়···

আমি যদি নিদ্রামুগ্ধ, স্তব্ধ হয়ে যাই
পৃথিবী গড়িয়ে পড়ে দশ আঙুলের ফাঁকে
আধো-খাওয়া আপেলের মতো।
আমার তা হোক—
তুমি শুধু মোহনিদ্রা ভাঙো।

বিশল্যকরণী নেই, ধমনীতে রক্ত আছে, দেবো—
তোমার পৃথিবী তুমি জেগে উঠে
ভিক্ষু হাতে ধরো ॥

শুধু

এ কোন্ আশ্চর্য দ্বীপ
নাকি দ্বীপ নয়
মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বাঁধা আছে
অদৃশ্য জিঞ্জিরে

সৈকতে ফেনার ফুল
ফেনাফুল নয়
ঘনীভূত অশ্রুর শিকল
জড়িয়েছে দশদিক্
আদিগন্ত স্মৃতির প্রশ্রয়
এই দ্বীপ
নাকি দ্বীপ নয়

শুধু সিন্ধুর বিভ্রম
বহুকাল ভেসে আছে একা

উচ্চারণ

ওই ওষ্ঠে, ও-অধরে, বৃষ্টিমাখা এমন সন্ধ্যায়
ও কী উচ্চারণ করো ? থাক থাক, ও কথা কোয়ো না।
ওসব পারি না শুনতে, দুঃখকষ্ট সকলেরি থাকে
চিনি-আলু-কেরোসিন-লোডশেডিং-ইশকুল-মাস্টার—
এ-সবই বাস্তব, কিন্তু আমি তার কী করি উপায় ?
কতকাল পরে দেখা, এ মুহূর্ত বড়ো মূল্যবান—
উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে কথা ভাল লাগে না একদম
পশ্চিমের আলো এসে পড়েছে তোমার নগ্ন হাতে
সোনার সীতার মতো আধোখানি হয়েছো সোনার—
প্রসঙ্গ বদল করো, এখানে কি ওকথা মানায় ?

তার চেয়ে এসো হাতে হাত রেখে দিগন্তে তাকাই
ওই দ্যাখো সূর্য ডোবে লজ্জারাঙা গঙ্গার উরুতে
আকাশের নীবিবন্ধে পদ্মবীজ মালার মতন
ঝুমঝুম ঝাঁক বেঁধে নাম-না-জানা পাখি উড়ে যায়—
কোথায় যাত্রার শুরু কে জানে যাত্রার সারা কোথা
কী হবে ওসব ভেবে, হে আমার প্রিয়াঙ্গী রমণী,
সূর্য, নদী, বলাকার সমগোত্রা, তুমিও সুন্দর—
তোমারও নয়নভঙ্গে স্তব্ধ ঢেউ, উড়ন্ত কাকলি।
ওদের তো দুঃখ নেই ? তুমি কেন দুঃখ শব্দ বলো ?

এই দ্যাখো পথপ্রান্তে ঘনশ্যাম শোভন বনানী
প্রান্তরের বুক ঢেকে ইতস্তত বকুলজারুল
এদেরও শ্রাবণ মাসে কোনো দুঃখ নেই।
তোমারও যৌবন, কন্যা, পল্লবিত, দর্পিত, সবুজ
তুমি ক্লান্তিহরা হও ; শ্যামচ্ছায়া, স্বপ্নিল, শীতল—
পথিককে ছায়া দাও।
গাছের কি ক্লান্তি আছে ? গাছ শুধু আশ্রয় সাজায়।

তুমিও তরুর মতো, তুমিও তৃণের মতো হও।
দুঃখ শুধু পুরুষের ক্ষত—
তুমি তাতে যৌবনের প্রলেপ লাগাও।

যুবতী নারীর ওষ্ঠে 'দুঃখ' শব্দ মানায় না বস্তুতঃ
ও বড়ো কঠিন শব্দ, ওতে দাবী শুধু পুরুষের
তোমরা তো সুখ নেবে, সুখ দেবে, সুখের পসারী
সমর্থযৌবনা বরনারী
রৌদ্র জল বায়ু মাটি শূন্যের সমান দরকারী—
সুন্দরী, মোহনবাঁশি ওষ্ঠাধর রুক্ষ অভিযোগে
গরীব দুঃখীর মতো দীনহীন বিবর্ণ কোর না,
ওই আলোচনা থাক। ওসব সংসারী শাড়ী খুলে
এখানে সন্ধ্যায় এসো পাতা, পাখি, নদীর মতন

তোমরা কবিতা হবে, তোমরাই কবির সম্পদ
অমন তীব্রতা কেন, চোখে-মুখে মেঘছায়া কই ?
দৃষ্টিতে মদিরা ঢালো,
পিপাসার্ত অঞ্জলি পেতেছে, বেলা যায়,
ওসব অপ্রিয় কথা এ সন্ধ্যায় নয় প্রিয়সখী,
গার্হস্থ্য প্রমাদগুলি কবি নয় গৃহস্থকে বোলো—
আজ শুধু স্তুতি হোক যৌবনের, শ্রাবণসন্ধ্যায়
তোমার আধখানা সোনা,
এমনই রহস্যময়ী হয়ে থাকো মৌন নীলিমায়
চোখে চোখে কথা হোক মন-গড়া দ্বীপে,
কবিতে, এবং কবিতায়।

ভাষান্তর

এসো, চুম্বন দাও,
বলো, দূরে যাবে না কখনো।
এসো, হাতে তুলে নাও সমস্ত গোধূলি—
এখনি আঁধার নামবে,
মুছে যাবে পথ, দৃশ্যপট।

এসো, চুম্বন দাও,
তারপরে বলো সেই কথা
যেই শব্দ উচ্চারণ করা সাজে তোমারি কেবল
যার সামনে রাত্রি নয়,
পড়ে আছে দিবা দ্বিপ্রহর।

যে-কথা আমার ঠোঁট ছেড়ে গেছে বহুকাল হলো
উচ্ছিষ্ট সেই শব্দে করবো না অতিথি-সৎকার,

এসো, চুম্বন দাও,
তারপরে শিরায় শিরায়
সেই শব্দে অগ্নিময় নৈঃশব্দ্যের প্রতিধ্বনি তুলি
ধ্বনি, প্রতিধ্বনি তুলি অব্যক্ত বাক্যের
শ্রবণের গহনে বাজাই
শোণিতে নিহিত সংলাপ

জিহ্বা তত দীন নয়,
জিহ্বা আরো গূঢ় ভাষা জানে।
এসো, চুম্বন দাও,
সেই ভাষা তোমাকে শেখাই—
জিহ্বায়, ওষ্ঠাধরে, শিরাধমনীতে
শ্রবণে যা শাশ্বত অধরা।
রক্তে কলস্বরা

মুখোমুখি

দু'একটা মুখের সামনে দাঁড়াতে পারি না
মনে হয় মুখ ধোওয়া নেই
মনে হয় মুখে বুঝি ময়লা লেগে আছে

কোনো কোনো মুগ্ধ মুখ দর্পণের মত স্বচ্ছ কিনা,
দেখা যায় স্পষ্ট নিজেকেই—
নিজের চেয়েও বেশি কাছে।

প্রভুর কুকুর

প্রভুর কুকুর হয়ে কেটে গেছে অগুনৃতি বছর।
কেবল বাতাস শুঁকে শত্রুতার গন্ধ চিনে নেওয়া

তারপর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের হুংকার, ছুটোছুটি
শিকার কামড়ে এনে শ্রীচরণে নম্র নিবেদন
অতঃপর লেজ নেড়ে পদতল চেটে
বকশিশের অস্থিখণ্ড মুখে ধরে চুষির মতন
তৃপ্ত শুয়ে-পড়া। এইভাবে ক্লান্তিহীন অগুনৃতি বছর
প্রভুর আদর।

এখন যৌবন গত। ভূতগ্রস্ত একক শিকারী
সারারাত্রি চতুর্দিকে দুর্নিবার শত্রুশব্দ শোনে—
জানালা-দরজায় টোকা, মেঝেয় কি ছাদে
দেওয়ালে দেওয়ালে শোনে পদশব্দ—
নিশ্বাসের বাতাসটুকুও, আকাশ, প্রান্তর, বনমালা
কদাচ শত্রুর বিষবাষ্পমুক্ত নয়।

সারাদিন ক্লান্ত, দীন, কেটে যায় আচ্ছন্ন নিদ্রায়
রাত্রিভোর অশরীরী পশ্চাদ্ধাবনা
অন্তহীন সীমার লড়াই।

আকণ্ঠ চীৎকৃত কান্না,
শূন্যভেদী বিলোল ধিক্কার।
বহুকাল প্রভুহীন, বহুকাল পথের কুকুর।

বহুকাল, নিজেই শিকার।

সুতরাং

সুতরাং, আমার আর ইচ্ছাশর্তে পতন হল না।
তিনি বাড়ালেন তাঁর অমোঘ অঙ্গুলি
তিনি বাড়ালেন হাত
স্পর্শ মাত্রে দাউ দাউ জ্বলে গেল সমস্ত শূন্যতা
পাদতলে জল হয়ে গেল
মৃত্তিকার সৃষ্টি হল, সূর্যের শাসনে
মাথার উপরে এল মহাকাশ।
তিনি বললেন, যদি পড়তে হয়
যতো নিচে পড়ো
জলে কি আকাশে ঝাঁপ দাও
শেষদিনে মৃত্তিকার
স্নেহস্পর্শে চিরক্ষমা পাবে।

উল্টো-সোজা

"এতো ঢাকঢাক-গুড়গুড়ের আছেটা কি মশাই
ভণ্ডামি ছেড়ে যা বলার তা
সোজাসুজি বলুন।"

—"দেখুন, জীবনটা সোজা নয়
জীবনে কিছুই সোজা যায় না

এমন কি হাত থেকে ঢিলটা ছুঁড়লেও
সেটা প্যারালাল হয়ে বেঁকে পড়ে।
একটা গাছ, সেও সূর্যের দিকে
প্রথমেই সিধে ওঠে না, গোড়ায় একটু আঁকেবাঁকে
তাল নারকোল খেজুর টেজুর দু-একখানা
পামজাতীয় একলসেঁড়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী
উদ্ভিদ্ ভিন্ন।   কিন্তু
তাদের শেকড়গুলো নেড়ে চেড়ে দেখেছেন কি ?
বলুন তো মাটির নিচে গিয়ে
তাদের সোজাসুজির জারিজুরি খাটে কিনা ?
উঁহু, সেখেনে তেনাদের ভেন্ন মূর্তি !
নদীর কথা বাদই দিচ্ছি—
এই আপনাদের মহদাশয় সমুদ্রের কথাটাই ধরুন,
একখানা ঢেউও কি সে সিধে পাঠায় ?
আর এই যে পূজ্যপাদ হিমালয়
তাঁর কোন্খানটা সোজা মশাই ?
তুচ্ছ বাতাস, ঈশ্বরের ফুঁ—
সেও খুব সোজা ধায় কি,
ক্ষণে ক্ষণে দিক্ পালটায়।
আমি সামান্য মানুষ
আমি কি করে সোজা বলব,
সোজা চলব ? হাঁটতে গেলেই
ডান পাটা একটু ডাইনে হেলে পড়ে
বাঁ পা-খানা বাঁয়ে হেলে যায়
সেই ছেলেবেলা থেকে
ঢের চেষ্টা করে দেখেছি মশাই
কিছুতেই নাকের সোজা হাঁটতে পারিনে।
একে কি আপনি ভণ্ডামি বলবেন ?
আমাকে কি বলবেন
দুমুখো সাপ ?

দেখুন দাদা
দুটো জিনিস কেবল সোজাসুজি চলে :
—আকাশ ফুঁড়ে বিষ্টি,
—আর চক্ষু ফুঁড়ে জল।
আর, একখানা কথাই কেবল
সোজাসুজি বলা যায় :
—মিথ্যে।"

বিকেলবেলার গান

তোমার নামের প্রভা জ্যোতির্ময় করেছে বিকেল
চিকন হাসির মধ্যে মখমলের বিছানা পেতেছো
বিকেলবেলার গান বাজিয়ে দিয়েছো দুই চোখে
নহবতখানার মতো, ভেসে যায় দূরান্তে সে স্বর
এইবারে ফুল চাই এ বিকেল ফুলের বিকেল
তারাফুল ফুটে উঠবে আকাশবাগানে কান্তিময়
উধাও সুগন্ধ হয়ে ঝেঁপে আসবে মৃদুল আঁধার
আলোফুল ঝরে পড়বে চোখের শয্যায় সুকোমল
তারার সুরভি ঠিক হৃদয়বিভার মতো চিকন চিক্কণ
মিশে যাবে হাসির মখ্‌মলে

অঞ্জলিতে ধরে আছি বিকেলবেলার সুখ
দুরু দুরু কবোষ্ণ চড়ুই, নরম, জীবন্ত, পক্ষধর
আনৃচান্ অস্থির প্রহর
বিকেল বেলার গানে, নক্ষত্রসুবাসে, থরথর
রাত্রি নেমে আসে
অঞ্জলিবন্ধনে কাঁপে প্রহরের ডানার উড়াল
একটুও আনমনা হলে আঙুলের শিক ভেঙে
লক্ষ্যহীন শূন্যে উড়ে যাবে—

অর্ধস্ফুট অঙ্গুলিতে পড়ে থাকবে উষ্ণ শিহরণ
অনিঃশেষ প্রার্থনার মতন আপসোস্।

তাই রুদ্ধশ্বাস, তাই এমন উদ্‌গ্রীব,
তৃপ্তিহীন, একাগ্র রয়েছি।

আমলকী শিমুল

যেতে যেতে হঠাৎ কখনো
ট্রেন থেকে নেমে যাবো ধূপছায়া আমলকী আঁধারে

পথের দু'ধারে শুধু চন্দ্রকান্ত মণির মতন
জোছনা-গলা আমলকীর ফল
ঝুমঝুম মহুয়ার হাওয়া।

চুম্বনের প্রতিধ্বনি ভেঙে দেবে অরণ্যের ঘুম
চমকিত ডানা মেলে আমলকী বনের ময়ূর
আধো-খাওয়া ফল ছেড়ে উড়ে যাবে অযোধ্যা পাহাড়ে

আমলকীর বন থেকে পথ যাবে শিমুলতলায়।

সময় হয়েছে বুঝে হঠাৎ না-বলে
ট্রেন থেকে নেমে যাবো প্রস্তুতিবিহীন।

টুপ করে ঝ'রে যাবো প্রতীক্ষায় সবুজ মাটিতে
শ্বেত শুভ্র আমলকীর ফলের মতন—
অথবা, কে জানে, হয়তো রক্তারক্তি, বিচ্যুত শিমুলে।

সুন্দরবন

ওরা ভাবছে চুলের বনে হাঁক দিয়েছে রুপুলি বাঘ
ওরা ভাবছে রূপ ভেঙেছে এবার কেবল রুপোরই হাঁক
এবার বুঝি অন্ন স্বপাক। ওরা জানে না।

ওরা কি জানে, রূপের নীচে লুকিয়ে আছে আরেকটা রূপ
সেই রূপটাই জ্যান্ত ভীষণ হেঁতালপাতার মধ্যে যেমন
ঘাপ্‌টি মারা বাঘের ডোরা। চলতে ফিরতে প্রাণের তলায়
আড়াল থেকে আলতো ঝাঁপায়, আছড়ে মারে,
ঘাড় ভেঙে দেয় আরেকটা প্রাণ, কি দুর্দান্ত !
বাইন গাছের ডালকে যেমন আঁকড়ে ঝোলে মৌমাছিচাক, মধু বেবাক্‌

বিষের জ্বালা সইতে পারলে / ধৈর্য ধরে
রইতে পারলে / আপনি তোমার মধুর হাঁড়ি
ভর্তি হবে। ওরা কি জানে, মহাল ভাঙা ?
ওরা জানে না।
চুলের মধ্যে রুপুলি হাঁক বুকের মধ্যে সোনালি চাক
রূপটা কেবল বাইরে থেকে ভেতরে যায়,
রূপ ভাঙে না। ওরা জানে না।

খাঁড়ির জলে ভর্তি কামট, দাঁত ধারালো
ও-জলে হাত দিও না, পা দিও না, স্নান করো না
ও-জলে মরণ-কামড় কামট ভরা, হেই সামালো—

কিন্তু তোমায় নৌকো তাতেই বাইতে হবে, হেঁইও হোঃ
ভাটার টানে সেই জলেতেই 'আল্লা' বলে
প্রাণের দায়ে ঝাঁপ দিয়ে গুণ টানতে হবে, হেঁইও হোঃ
না জানে তো এসব খবর ওদের এবার জানতে হবে, হেঁইও হোঃ।

নীল দানিয়ুব

নীল দানিয়ুব এসো, শোবে এই উপত্যকায় ?
গাঙ্গেয় পলির বুকে এই ছাখো বুদা পাহাড়ের
সমস্ত প্রস্তর, শিলা, উদ্ভিদ সকল, ফল-ফুল, বনজ প্রাণীরা
নিশ্চিন্তে ঘুমায় ।

নীল দানিয়ুব, এসো, পেতে দেবো দৃপ্ত হিমালয়
বুদা পাহাড়ের চেয়ে সুমহৎ উপত্যকায়
তুমি সুখী রয়ে যাবে ।

নীল দানিয়ুব, এসো, ছিঁড়ে ফেলো সেতুর মালিকা
স্লুইস গেটের সব মিথ্যে প্রতারণা ভেঙে ফেলে
ফুলে ওঠো, ফুঁসে ওঠো, প্রচণ্ড বন্যায়—

এইসব ধানজমি, এইসব গম, ভুট্টাক্ষেত
অফলা, নিষ্ফলা, ছাখো, কতকাল ।   প্রচণ্ড খরায়
এইসব সাজানো বাগান ঝরে যায়—

নীল দানিয়ুব, আয়, বঙ্গোপসাগরে তোর ঘর বেঁধে দেবো
মার্গিট সীগার্ট দ্বীপ হয়ে যাবে গঙ্গায় ব-দ্বীপ
জলের গভীরে কোনো হাহাকার, ঘূর্ণি জাগবে না—

নীল দানিয়ুব এসো, একবার সাহস করে শুধু
হিন্দুকুশ পার হয়ে চলে এসো সিন্ধুর পাড়ায় ।
তারপর গঙ্গা খুব কাছে ।

ম্যাজিকওয়ালা

কেউ যে কখনো কাউকে রূপনারায়ণ
দেখাবে, এটাতে আর আশ্চর্য কি আছে
কেউ তো কখনো কাউকে রূপনারায়ণ
দেখাবেই যতদিন পৃথিবীতে রূপনারায়ণ
এমন নামের কোনো মুগ্ধ নদ আছে

কেউ যে কখনও কাউকে মেঘ-ছেঁড়া আলো
দেখাবে, এটাতে আর আশ্চর্য কি আছে
কেউ তো কখনো কাউকে মেঘ-ছেঁড়া আলো
দেখাবেই যতকাল ত্রিভুবনে মেঘ-ছেঁড়া আলো
এমন নামের কোনো ঐশ্বরিক ইন্দ্রজাল আছে

তুমি যে সবার আলো সমস্ত ম্যাজিক
একাই দেখিয়ে গেছো, অবাক আমাকে—
রূপনারায়ণের কূলে সেই থেকে জেগে বসে আছি
একা একা খেলা করি মেঘ-ছেঁড়া আলোর প্রবাসে

দেবতার কাল

১

রোদনাদতিনিঃশ্বাসাদ্ ভূমিসংস্পর্শনাদপি
ন ত্বাং দেবীমহং মন্যে…সুন্দর ৩৩ ১০
রাজ্ঞঃ সংজ্ঞাবধারণাৎ

দীর্ঘশ্বাস, ভূমিস্পর্শ, অশ্রুবিমোচন—
এ-সকল দেবোচিত নয়।
শুধু স্মিতহাস্য, শুধু শূন্যে রাখা কমলা চরণ,
বিনাশ্বাসে বেঁচে থাকা।

শোক কি বিস্ময়,
হে ঈশ্বর, দেবোচিত নয়।

মুছে যাক রাজচিহ্ন, লুপ্ত হোক পার্থিব লক্ষণ,
নামুক প্রলয়—
আত্মরূপ আসুক স্মরণ—
সূর্য ঢেকে মেলে দাও গরুড়ের পাখা,
ঝরাক অগ্নি তৃতীয় নয়ন,
এখন সময়।

২

I am fire, and air ; my other elements
I give to baser life.

অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা

জলে স্থলে কাজ নেই।—
থাক শুধু তেজ, মরুৎ, ব্যোম।
মুছে যাক স্তন, কটি, কটাক্ষ, কুন্তল—
মুছে যাক হাসি, অশ্রুজল
লুপ্ত হোক তোর জল স্থল—
আমার আকাশ থাকবেই।